বণিক-বালা

উপন্যাস



বীরপূজা, ময়ূর-সিংহাসন, বেহুলা, পল্লীর-পরিণাম

প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা

শ্রীহরনাথ বসু-প্রণীত।

প্রকাশক—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

১৩২২

[মূল্য ৸৹ বার আনা মাত্র।

প্রিণ্টার—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাস,
মেট্‌কাফ্‌ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌ ;
৩৪নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা।

উৎসর্গ

বঙ্গ-সাহিত্যানুরাগী, স্বধর্ম্মনিরত,

শিখ-সমাজ-শিরোমণি

শ্রীযুক্ত মণিলাল সিং, এম্. এ.,

মহোদয় অগ্রজপ্রতিমেষু—

দাদা,

আপনি আমায় সহোদরের ন্যায় স্নেহ করেন। আপনারই মহেশমণ্ডাস্থ বিজনবাসে বসিয়া দেড় বৎসর পূর্ব্বে উপন্যাসখানি লিখিতে আরম্ভ করি। পুস্তকের পাণ্ডুলিপি পাঠে আপনি প্রীত হইয়াছিলেন। তাই ভ্রাতৃভক্তির অকিঞ্চিৎকর নিদর্শনস্বরূপ গ্রন্থখানি আপনার করকমলে রাখিয়া দিলাম।

আপনার স্নেহের—

হরনাথ।

ভূমিকা

লর্ড লিটন কৃত Lady of Lyons নামক ক্ষুদ্র নাটিকা অবলম্বনে উপন্যাসখানি রচিত হইয়াছে।

গ্রন্থকার।

বণিক-বালা





প্রথম পরিচ্ছেদ

নগরপ্রান্তে একখানি ক্ষুদ্র কুটির। স্থানটি বড় নির্জ্জন; কুটিরখানি বড় জীর্ণ। একটা প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ মায়ের মত সেই মৃন্ময় গৃহটুকু বুকে করিয়া রাখিয়াছে। নতুবা শ্রাবণের ধারায় বা বৈশাখের ঝড়ে তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত থাকিত না। পার্শ্বে একটী ছোট নদী রূপার হারের মত পড়িয়া আছে। গ্রীষ্মকালে নদীতে প্রায়ই জল থাকে না—বর্ষায় বেশ পরিপুষ্ট হয়। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন শরৎকাল, কিন্তু নদীটী কূলে কূলে পরিপূর্ণা। তীরে যতদূর দৃষ্টি যায় দিগন্তহীন মাঠে কে যেন স্বুবর্ণরাশি ঢালিয়া দিয়াছে। বীচিবিক্ষেপ-চঞ্চলা তটিনীর ন্যায় সেই হেমকান্তি হরিৎক্ষেত্র সমীরোচ্ছ্বাসে শ্যামাঞ্চল দুলাইতেছে।

নদীতটবর্ত্তী বিশাল বটবৃক্ষের ঘন-পত্রান্তরাল হইতে দয়েল ডাকিয়া উঠিল—পাপিয়া কথা কহিল—বেণেবৌ বিনয় করিয়া ডাকিল—বউ-কথা-কও। বিহঙ্গের সে মধুর কলধ্বনি সমীরণে ভাসিতে ভাসিতে আকাশে

মিলাইয়া গেল। কতক্ষণ পরে কু-উ করিয়া একটা কাল পাখী খানিকটা বিরহের বিষ ঢালিয়া দিল। কোকিল সপ্তমে চড়িয়া ডাকিতে লাগিল। আকাশ, সমীরণ, নদীর কলধ্বনি—সব যেন সেই সুরে সুর মিলাইল। শরৎ-সন্ধ্যার সুনীল গগনতলে সেই বিরহের গাথা অবিরাম ধ্বনিত হইতে লাগিল।

সহসা কুটিরাভ্যন্তর হইতে এক যুবক ত্রস্ত ভাবে বাহিরে আসিল এবং ইতস্ততঃ নিরীক্ষণপূর্ব্বক বটবৃক্ষের দিকে চাহিয়া বিরক্তির সহিত বলিয়া উঠিল—দূর হ! ঠিক সেই সময়ে এক বৃদ্ধা যুবকের সম্মুখে আসিয়া কহিল:—কি হয়েছে সনাতন, কার সঙ্গে কথা কচ্ছিস্?

লজ্জাহীন পাখী ডাল হইতে বাঁধা সুর আরো চড়াইয়া ডাকিল কু-উ! যুবক দুই কাণে অঙ্গুলি দিয়া কহিল:—দেখ দেখি মা, পাখীটা আমার সব কাজ নষ্ট করে দিলে? আহা, ছবিখানা যা হ'য়ে আসছিল, কি আর ব'লব! প্রাণপ্রতিষ্ঠাটী হয় হয় এমন সময় ওই কালামুখো পাখী চেঁচিয়ে আমার মগজটাকে একেবারে মাটি করে দিলে!

বটের ডালে বসিয়া, দিগন্ত মাতাইয়া কোকিল তখনও ডাকিতেছে —কু-উ—কু-উ—কু-উ!

যুবক ঢিল কুড়াইয়া পাখীর উদ্দেশে আকাশ পানে ছুড়িল—মানুষের অধম করিয়া তাহাকে গালি দিতে লাগিল। বৃদ্ধা বিরক্ত হইয়া কহিল:— আচ্ছা সনাতন, তোর হ'য়েছে কি! গাছের উপর পাখী ডাকছে, তোর তাতে রাগ কিসের?

সনাতন। বুঝবে না মা, বুঝবে না—ও বড় ভয়ানক পাখী। আহা, কি ছবিই আঁকছিলাম গো! দেখবে এসো মা, দেখবে এসো!

পাঠকের বোধ হয় বুঝিতে বাকী নাই—মাতা পুত্রে কথোপকথন হইতে-ছিল। এ প্রসঙ্গে জানিয়া রাখা ভাল বৃদ্ধার নাম নিস্তারিণী ; কিন্তু সকলে তাহাকে 'সোনার মা' বলিয়াই জানে। সোনার মা সারাদিন বাড়ী ছিল না —নিকটস্থ কোন গ্রামে ধান ভাণিতে গিয়াছিল। দুই পালি ধান লইয়া সবে মাত্র সে ফিরিয়াছে। পুত্রের কথায় ধানের পালিটী উঠান হইতে ভগ্ন দাওয়ার উপর বসাইয়া দাওয়ার উপর উঠিল। দাওয়ার একদিকে সামান্যরূপ রাঁধিবার সরঞ্জাম, অপর দিকে একটা ভাঙ্গা চরকা আড় হইয়া পড়িয়া আছে। কোণের দিকে একটা কাঠের ডেরকো দণ্ডায়মান। বহুদিন এক ভাবে এক স্থানে থাকিয়া উহার তলদেশের অনেকটা প্রোথিত হইয়া গিয়াছে এবং প্রকৃতপক্ষে উহাকে এখন স্থাবর সম্পত্তি আখ্যা দেওয়া যায়। চালের কাছে একটী ভাঙ্গা দাঁড়ে অনেক দিনের টিয়া পাখীটি চুপ করিয়া বসিয়াছিল ; বুড়ীকে দেখিয়া ঘন ঘন মাথা নাড়িতে আরম্ভ করিল। একটী ভাঙ্গা খাঁচার মধ্যে একটা শালিক ঝিমাইতেছিল ; সোনার মার সাড়া পাইবামাত্র সে চেঁচাইতে লাগিল। বৃদ্ধা তাহাদের সহিত দুইচারিটা কথা কহিল। দরজার সম্মুখে একটী রোগা বিড়াল ঘুমাইতেছিল, বুড়ী তাহাকে সরিয়া যাইতে বলিল। বিড়ালটা উনানের পাশে গিয়া বসিল। মায়ের বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া সনাতন ব্যস্ত হইয়া বলিল :—শীঘ্র এসো মা ! পাখীটে কি সর্ব্বনাশ করলে দেখবে চল ?

সোনার মা। বালাই, সর্ব্বনাশের কথা কি বলতে আছে ? এই যে বাবা, যাচ্ছি। বুড়ো হয়েছি—তাড়াতাড়ি কি আর চলতে পারি !

বলিতে বলিতে বৃদ্ধা পুত্রের সহিত ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। ঘরে

আসবাব পত্র কিছুই নাই। একখানা ভাঙ্গা তক্তাপোষে কতকগুলা ছেঁড়া কাঁথার বিছানা। দেয়ালের গায়ে কয়েক খানা ঠাকুরদেবতার পুরাতন পট। চিত্রকরের ও কালের মাহাত্ম্যে কোনখানি আর চিনিবার উপায় নাই! এক কোণে অনেকগুলি হাঁড়ি কলসী অসম্বদ্ধভাবে সজ্জিত। দরজার ঠিক সম্মুখস্থ প্রাচীরগাত্রে একখানি কাষ্ঠফলক, তদুপরি একখানি কাপড়ের পর্দ্দা ঝুলান আছে। মেজের উপর মাটির পাত্রে লাল, নীল, হরিৎ প্রভৃতি রং রহিয়াছে। বৃদ্ধা শেষোক্ত সরঞ্জাম-সমূহ দেখিয়া বড় রাগ করিল। বলিল :—এই কোরে কি দিন কাটাবি?

সনাতন। তোমার পায়ে পড়ি মা, উপদেশটা একটু পরে দিও; এখন কিছু বোলো না; যা এঁকেছি, দেখে একবার চক্ষু জুড়াও।

সনাতন সযত্নে প্রাচীরগাত্রের পর্দ্দাখানি উঠাইল। বৃদ্ধা দেখিল, কাষ্ঠফলকে একটী রমণীর চেহারা অঙ্কিত! সনাতন ফুলব্যবসায়ী হইলেও মূর্খ নহে। তাহার পিতা অনেক যত্নে তাহাকে সংস্কৃত শিখাইয়াছিল। ভাবে গদ্গদ হইয়া সনাতন বলিয়া উঠিল :—

তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণী প্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ।

বুঝলে মা, ঐ চোখ দুটোতেই প্রাণ—ঐটী হয় হয় এমন সময় গাছের ওপর থেকে বজ্রাঘাতের মত পাখীটে ডেকে উঠল; আর তুলি টানতে পাল্লুম না! মনটা কেমন একেবারে মাঠের চেয়েও ফাঁকা হয়ে গেল! যাহোক মা, কেমন হয়েছে বল? মন থেকে মনে কোরে এঁকেছি। যাও—মিলিয়ে নাওগে; কোন্‌টা সজীব বুঝতে পারবে না!

পুত্রের কথাবার্ত্তা শুনিয়া, ভাবভঙ্গী দেখিয়া বৃদ্ধার মনে বড় ভয় হইল।

ব্যাপার কি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল :—এ কার ছবি ?

সনাতন। ভানুমতির।

সোনার মা। কোন্ ভানুমতির—সদাগরের মেয়ের ?

সনাতন। তা নয় ত আর কার ? দেখে নিও মা, ঠিক হবে! তোমার সনাতন বড় ভাগ্যবান্—তুমি বড় ভাগ্যবতী—রাজকন্যা এসে তোমার সেবা করবে! এখন বুঝেছি, বাবা আমায় কেন এত কোরে কাব্য অলঙ্কারাদি শিখিয়েছিলেন—একটা মূর্খ হ'লে আমায় আজ পুঁছত কে ?

সোনার মা। এখনই বা পোঁছে কে ?

সনাতন। কেন, সে!

সোনার মা। ছিঃ বাবা—ও কথা মুখে এনো না—হাতে হাতকড়ি পড়বে যে বাপ! তুমি আমার অন্ধের নড়ি—কৃপণের কড়ি—একমুখো রুদ্রাক্ষী—তোমার এ দুর্ম্মতি কেন বাপ ?

সনাতন। ও সব কথা মনেও এনো না। এর মধ্যে 'মৌনং সম্মতি-লক্ষণং' হ'য়ে গিয়েছে! তিনদিন বাগানের সেরা ফুলগুলি উপহার পাঠিয়েছি। লুকিয়ে তার বাগানের ভেতর থেকে দেখে এসেছি—সব ফুল ফেলে আমার ফুল বুকে গুঁজে ভানুমতি ভাবে ভোর হ'য়ে গিয়েছে!

সোনার মা। সনাতন, বামন হ'য়ে চাঁদে হাত দিতে যাস্‌নি বাপ! কোথায় কুবেরের মেয়ে—আর কোথায় এই দুঃখিনীর ধন! পেটে অন্ন নেই—চালে খড় নেই—শীতে বস্ত্র নেই। ভুলে গেছিস্ কি বাপ, তুই যে সেদিন পর্য্যন্ত তার বাগানের গাছে জল দিয়ে বেড়াতিস্!

সনাতন। তাতে কি হ'য়েছে মা! তোমার কাছে সত্য বলছি—তার বাগানের কাজ কত্তুম আর তাকে দেখতুম; দেখে দেখে পৃথিবীটা এখন কেমন এক রকম হয়ে উঠেছে! আর তার সঙ্গে বিবাহ হতে বাধাটাই বা কি মা? তারাও বৈশ্য—আমরাও বৈশ্য; সুতরাং জাতে ঠিক আছি। তা ছাড়া তোমার আশীর্ব্বাদে, মা, আমার চেহারাটাও মন্দ নয়— পেটেও বিদ্যা আছে। এক কথা—পয়সা নেই। তাতে কি এসে যায়? আর বলতে কি, ধনপতি সদাগর সুদখোর—কশাই; তার দ্বারে ভিখারী ভিক্ষা পায় না! সে পয়সায় লাভ কি মা! তার চেয়ে আমার হাতে দুপয়সা হ'লে আমি বরং দুজনকে খাইয়ে বাঁচি! সত্য কথা বলতে কি মা, তার মন যদি পাই, তা'হলে এ সব ধান, চাল, খড় কুটোয় কিছু আট্‌কাবে না! আমি আজ মনের কথা খুলে জগন্নাথের হাতে এক পত্র দিয়েছি। ভাবছো কেন মা, এখনই শুভ সংবাদ এল বলে?

সোনার মা। বাবা, কি করলি! চল—তোকে বৈদ্য দেখিয়ে এখনই এদেশ ছেড়ে পালাই! সদাগরের বাড়ী এ খবর গেলে এখনই আমাদের বেঁধে নিয়ে যাবে! চল—চল সনাতন, শীঘ্র চল—আর একদণ্ড এখানে থাকা হবে না।

সনাতন। আচ্ছা মা, দেখা যাবে; জগন্নাথ ফিরে আসুক। এখন তুমি রান্না চড়িয়ে দাও—পেটের ভেতর আগুন জ্বলে উঠেছে—বত্রিশ নাড়ী ঘুরপাক খাচ্ছে!

ভয়কাতরা বৃদ্ধা কাঁপিতে কাঁপিতে কাঁদিতে কাঁদিতে বাহিরে আসিল। মনে মনে বলিল—জগদম্বা, আমার সোনাকে সারিয়ে দাও; আমি তোমায় বুক চিরে রক্ত দেব!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সনাতন নদীতীরে পদচারণ করিতেছে আর উদ্‌গ্রীব হইয়া এক একবার আঁকাবাঁকা মেঠো পথের পানে চাহিয়া দেখিতেছে। এদিকে সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়—সমস্ত পশ্চিমাকাশ লাল হইয়া উঠিয়াছে। বড় অনির্ব্বচনীয় লাল—প্রকৃতির ইন্দ্রজাল! দেখিতে দেখিতে আকাশের সে সুবর্ণজ্যোতি কোথায় মিলাইয়া গেল—অল্পে অল্পে ধূসর-সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকাররাশি নদীর স্বচ্ছ জলে প্রতিবিম্বিত হইতে লাগিল—যেন ষোড়শীর সুন্দর চক্ষে ভ্রমরকৃষ্ণ ভ্রূযুগলের ছায়া আসিয়া পড়িল। দূর মাঠ হইতে এক একবার কৃষকের সঙ্গীতধ্বনি বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে—কদাচিৎ দুএকটা কৃষ্ণপক্ষী মাথার উপর দিয়া দ্রুত উড়িয়া যাইতেছে।

এই অপূর্ব্ব দিনান্ত-শোভা দেখিতে দেখিতে সনাতন এতক্ষণ এক সুখস্বপ্নে বিলীন ছিল। যখন দেখিল রাত্রির আর বিলম্ব নাই—পথ ঘাট আর প্রায় দেখা যায় না—তখন সে চিন্তাপীড়িত হইয়া পড়িল। জগন্নাথ কি পত্রোত্তর লইয়া আসিতেছে—ইহা ভাবিতে ভাবিতে সনাতন অস্থির হইয়া উঠিল। হঠাৎ দেখিল নিকটেই জগন্নাথ! সনাতন চীৎকার করিয়া বলিল:—ভো—ভো, জগন্নাথ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে! কি খবর জগন্নাথ?

জগন্নাথ। খবর খুব জবর; একেবারে কুপোকাৎ—বাজিমাৎ!

সনাতন। না না, ঠাট্টা কচ্ছ! ওই যে তোমার ওষ্ঠের অন্তরাল থেকে ভগ্নপ্রায় দন্তপংক্তি বিকসিত হচ্ছে।

জগন্নাথ। রাখ দাদা তোমার কবিতা! আর একটু হলে জন্মের মত দাঁত বেরিয়ে পড়েছিল আর কি! বরাতে ছিল, কোন রকমে প্রাণটা নিয়ে আসা গিয়েছে।

সনাতন। এ্যাঁ! সে কি! কই, চিঠির উত্তর দেখি?

জগন্নাথ। উত্তর কাগজে কলমে নেই, এই দেখ পিঠে—আস্কে পিঠে গজিয়ে উঠেছে; এই দেখ গাঁটে গাঁটে খেঁটের চোটে বাত ধরেছে; বাকি আছে মাথাটা—আব একটু থাকলে তাও ফুটি-ফাটা হয়ে যেত!

সনাতন। দূর ছাই, এ ত সব তোমার কথা বল্লে; আমার কি হ'ল?

জগন্নাথ। আরে তোমার জন্যই ত আমার এই হ'ল।

সনাতন। আরে তা নয়—তা নয়; চিঠিখানা পড়ে কি বল্লে?

জগন্নাথ। তা ত দেহখানা খুলে দেখিয়ে দিলুম; আর কি করে বল্‌ব?

সনাতন। একটু পরিষ্কার করে বল ভাই, আমার মাথাটা কেমন গুলিয়ে গেছে। কাণেও শুন্‌ছি কম, চোখেও দেখছি যেন সরিষা-ফুল। যা যা ঘটনাগুলি ঘটেছে ঠিক ঠিক বলে যাও—সব শুনে অন্য উপায় দেখি।

জগন্নাথ। উপায় এখন চম্পট—পেছন দিকে না চেয়ে ধাঁই-ধুঁই চম্পট! পৈতৃক প্রাণখানি যদি বাঁচাতে চাও তাহলে ভানুমতিকে শিকেয় তুলে রেখে এখন শুধু খাও দাও আর কাঁসি বাজাও!

সনাতন। ও সব বাজে কথা এখন মুলতুবি রেখে আসলখানা আমায় খুলে বল—ব্যাপারটা কি হল?

জগন্নাথ। ব্যাপার কিছুই নয়—আমি গিয়ে চিঠিখানি পাঠিয়ে দিয়ে খানিকক্ষণ দেউড়ীতে দাঁড়িয়ে রইলুম। তারপর একটা দশবাই চণ্ডী মাগী, এক হাতে ঝাঁটা আর এক হাতে খেঁটে—এই দুই ব্রহ্মাস্ত্র নিয়ে এসে হুপ কোরে আমার উপর পড়ল। তারপর কি হয়েছে আর কিছুই মনে নাই। বাড়ীর কাছাকাছি এসে যখন চৈতন্য হল—তখন দেখি চৈতনটী গেছে; আর দেহের এই অবস্থা! আর কি বলব বল!

সনাতন একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া জগন্নাথকে বলিল :—"বন্ধু, তুমি বাড়ী যাও; আমি কিছু ভাবব; পরে দেখা হবে।" জগন্নাথ চলিয়া গেল। সনাতন নদীতটে বসিয়া অনেকক্ষণ ভাবিল; আপনা আপনি বিড়বিড় করিয়া কত কি বলিল; শেষে ধীরে ধীরে সে স্থান হইতে কোথায় চলিয়া গেল। সোনার মা বাড়াভাত লইয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ছেলের জন্য বসিয়া রহিল। সনাতন আসিল না—কাঁদিয়া কাঁদিয়া শেষ রাত্রে বৃদ্ধা সর্ব্বসন্তাপনাশিনী নিদ্রার ক্রোড়ে আশ্রয় লইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ধনপতি সওদাগর উজ্জয়িনীর সর্ব্বপ্রধান শ্রেষ্ঠী। তাঁহার গুপ্ত ধনাগারে কত যে সোণারূপা মণি মুক্তাদির সমাবেশ আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। রাজকোষে অর্থের অনটন হইলে ধনপতি রাজাকে ঋণ দিয়া থাকেন। রাজসমীপে শ্রেষ্ঠীর প্রভূত সম্মান। তাঁহার ঐশ্বর্য্যের কথা দেশে দেশে প্রবাদের মত রাষ্ট্র। সওদাগরের বিচিত্র হর্ম্ম্যাবলী, মনোহর উদ্যান, চিত্তবিনোদন প্রমোদকানন, রমণীয় অতিথিশালা প্রভৃতির কাছে স্বয়ং রাজ্যেশ্বরের প্রাসাদও অতি তুচ্ছ বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

এত ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াও সওদাগর অনেকটা সাদাসিদে প্রকৃতির লোক ছিলেন। অহোরাত্র বিলাসব্যসনে আসক্ত থাকিতে তিনি ভালবাসিতেন না। কিন্তু পতিগতপ্রাণা শ্রেষ্ঠিপত্নী রত্নমঞ্জরী স্বামীকে ইচ্ছানুরূপ চলিতে দিতেন না। রমণীর স্বভাবসুলভ রমণীয় অপাঙ্গ-ভঙ্গিমার সম্মোহন আকর্ষণে সেই পুরুষপুঙ্গব শ্রেষ্ঠিবর দীনহীন কাঙালী-টির মত কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়াইয়া থাকিতেন—কলের পুত্তলিকাপ্রায় উঠিতেন বসিতেন। এইরূপে স্বামীস্ত্রীর চরণে পরাণে একটা বিকট ফাঁসি লাগিয়া গিয়াছিল। রত্নমঞ্জরী যখন 'তোমারই গরবে আমি গরবিণী' বলিয়া আছাড় খাইতেন, স্বামীর তখন ভাবের ঘোরে ধনুষ্টঙ্কার উপস্থিত হইত। এই বীভৎস পত্নীবিকার সনাতন কাল হইতে সকল দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়।

ধন-গৌরবে রত্নমঞ্জরীর মাটিতে পা পড়িত না। কিসে তাঁহার বিপুল ঐশ্বর্য্য দেখিয়া নগরবাসিগণ বিমোহিত হইবে, রত্নমঞ্জরী সর্ব্বদাই সেই চিন্তা করিতেন। তিনি স্বীয় অট্টালিকায় একটা নহবৎখানা বসাইয়াছিলেন। প্রাতঃসন্ধ্যায় সেখানে বাদ্যধ্বনি হইত। অন্দরে ও সদরে শ্রেষ্ঠিবংশের যশঃকীর্ত্তনের জন্য দুইদল বৈতালিক নিযুক্ত হইয়াছিল। ধনপতি বৈঠকখানায় বসিলে দুইদিক্ হইতে দুইজন তাঁহার সম্মুখে চামর ঢুলাইত। শ্রেষ্ঠী লজ্জিত হইলেও পত্নীকোপানলের ভয়ে ব্যজনকার্য্যটী বন্ধ করিতে সাহস করিতেন না। বৈঠকখানা-বাড়ী হইতে অন্দরে যাইবার সময় ধনপতিকে সোণার একখানা চতুর্দ্দোলায় করিয়া যাইতে হইত। অনন্যোপায় হইয়া ধনপতি এ কার্য্যটী করিতেন বটে, কিন্তু গতিপথে চতুর্দ্দোলায় বসিয়া আপনা আপনি উন্মাদের ন্যায় হো হো করিয়া হাসিতেন। ভৃত্যগণ ধনপতিকে 'মহারাজ' ও রত্ন-মঞ্জরীকে 'রাণীমা' বলিয়া ডাকিত। উজ্জয়িনীর রাজাধিরাজের সমকক্ষ হইবার জন্যই রত্নমঞ্জরীর এবম্বিধ আয়োজন।

ধনপতির একমাত্র কন্যার নাম ভানুমতি। আশৈশব রত্নমঞ্জরী কন্যাকে নিজের ছাঁচে গড়িয়া তুলিয়াছেন। ভানুমতি এখন যোড়শী যুবতী। ধনপতি কয়েকবার পত্নীর নিকট কন্যার বিবাহের কথা তুলিয়াছিলেন। রত্নমঞ্জরী তাহাতে বিরক্ত হইয়া স্বামীকে বলিয়াছিলেন, "আমার কন্যার বিবাহ আমি দিতে জানি। এ বিষয়ে পুরুষের কথা কহা ভুল। রাজপুত্র ব্যতীত ভানুমতির কেহ স্বামী হইতে পারিবে না। মেয়েরও সেই মত।" শ্রেষ্ঠী:নির্ব্বাক্ হইয়া চলিয়া গেলেন। সেই অবধি তিনি আর কখনও বিবাহের কথা কহেন নাই।

রাত্রি অধিক হয় নাই। উজ্জয়িনীর রাজপথে এখনও জন-কোলাহল শ্রুত হইতেছে। মন্দিরে মন্দিরে আরতির বাজনা বাজিতেছে। বাজারে বিপণী-শ্রেণী আলোকমালায় সজ্জিত। ক্রেতার সংখ্যা কমিয়া আসিয়াছে; অনেকে দোকান বন্ধ করিবার জন্য ব্যস্ত। যাহাদের দিনটা বড় মন্দা গিয়াছে, তাহারা এখনও আশা ছাড়ে নাই; যাহারা লক্ষ্মীকে দূরে রাখিয়া বেকার বসিয়া শুধু দিনগত পাপক্ষয় করিল, তাহারা কোমর বাঁধিয়া দোকানের বাহিরে দাঁড়াইয়া নীরিহ পথিকগণকে ধরিয়া টানাটানি করিতেছে। পথের স্থানে স্থানে বেকার লোকের বিরাট্ বৈঠক বসিয়াছে। তাহার মধ্য হইতে থাকিয়া থাকিয়া মণ্ডলাকারে তাম্রকূটের ধূমরাশি ঊর্দ্ধে উঠিতেছে। সেই জনসঙ্ঘের আলোচ্য বিষয়ের অভাব নাই,—সকলে মহানন্দে পরনিন্দা পরকুৎসাদি করিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিতেছে। পরচর্চ্চাই, এখন জীবনের অনুশাসনপর্ব্বের প্রধান উপকরণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যতদিন পৃথিবীর ইতিহাসে মানুষের নাম থাকিবে ততদিন এ বিকট ব্যাধির উচ্ছেদ হইবে না।

ধনপতি সওদাগরের সুন্দর সৌধখানি দূর হইতে রমণীয় নাট্যশালার ন্যায় শোভা পাইতেছে। সিংহদ্বারের উপরে নহবৎখানা হইতে ইমন-কল্যাণ রাগিণীর মধুর সুর তরঙ্গে তরঙ্গে উঠিয়া সমস্ত নগরময় ছড়াইয়া পড়িতেছে। দিবানুরূপ উজ্জ্বল আলোকে রাজপথ পর্য্যন্ত ঝলমল করিতেছে। অট্টালিকার সমীপবর্ত্তী হইলে মনে হয়, রজনী বুঝি এস্থানে আসে নাই—পঞ্চবটী বনচর চিরবসন্তের ন্যায় এ বুঝি চির আলোকের রাজ্য। সন্ধ্যাসতী এ সৌধসন্নিধানে আসিয়া বন্ধ্যা হইয়া বিরাজ-মানা। কক্ষে কক্ষে আলোকমালার প্রাচুর্য্যে ক্রীড়ানিরত ক্ষুদ্র পতঙ্গটী

পর্য্যন্ত দূর হইতে দেখা যাইতেছে। অন্দরের সীমান্তে ভানুমতির বিলাস-কক্ষ ; তৎপশ্চাতে অপূর্ব্ব প্রমদোদ্যান। সনাতনের পিতা বহু যত্নে এই নন্দন রচনা করিয়াছিল। ভানুমতি সর্ব্বদাই স্বীয় কক্ষ হইতে উদ্যানের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিত। সনাতনের পিতার পরলোকপ্রাপ্তির পর সনাতন অনেকদিন উদ্যানটীর পরিচর্য্যা করিয়াছিল। সনাতন প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে সর্ব্বদাই বাগানে আসিত এবং তথা হইতে অবাক্ হইয়া ভানুমতিকে দেখিত। তাহার কত কথা মনে পড়িত—স্বপ্নে সে আকাশকুসুম দেখিতে পাইত। এখন আর সে সওদাগরের বাড়ী আসে না, মধ্যে মধ্যে বাগানের বাহিরের কোন নিভৃত স্থান হইতে ভানুমতিকে দেখিয়া যায়। আজ সনাতন হৃদয়ে বড় আঘাত পাইয়াছে ; তাহার মর্ম্মস্থানটা ছিঁড়িয়া গিয়াছে—বালির ঘরখানি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। জগন্নাথকে বিদায় দিবার পর নদীতীর হইতে উঠিয়া লক্ষ্যহীন ভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে সে ভানুমতির উদ্যানপার্শ্বে আসিয়া পড়িল। আবার সে আপনাকে আপনি হারাইল—আবার সেই পূর্ব্বাশা পুনরুদ্দীপ্ত হইল। ভয়, ভাবনা, পরিণাম সব ভুলিয়া সনাতন নিশ্চিন্তভাবে একটী প্রকাণ্ড বকুল গাছের তলায় বসিয়া ভানুমতির কক্ষের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। চতুর্থীর ভাঙ্গাচাঁদখানি ছিন্ন মেঘের সহিত লুকাচুরি খেলিতেছে—কুসুম-সুবাসিত সমীরণ সনাতনের প্রতি বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া চলিয়া যাইতেছে। মাথার উপর দিয়া কর্কশকণ্ঠে একটা পেচক ডাকিতে ডাকিতে উড়িয়া গেল। সনাতন উঠিয়া দাঁড়াইল। দেখিল ভানুমতির কক্ষে উজ্জ্বল দীপালোক-সম্মুখে অসংখ্য পতঙ্গ খেলা করিতেছে। সনাতনের কান্না আসিল ; সে আপনার উত্তপ্ত ললাটে

হাতখানি রাখিয়া বলিল ঃ—"হায়, ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গের যে অধিকার আছে আমার তাও নাই ; আমার জীবনে ধিক্ !"

সনাতন আলোক হইতে অন্ধকারের রাজত্বে প্রবেশ করিয়া কোথায় চলিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিবিধ বর্ণের বিচিত্র দীপালোকে ও ফুলের সাজে ভানুমতির বিলাস-কক্ষ যেন জ্যোৎস্নাধৌত কসুমিত উদ্যানবৎ শোভা পাইতেছে। দর্পণ-বিনিন্দিত মর্ম্মরপ্রস্তরের প্রাচীরগাত্রে অপূর্ব্ব কারুকার্য্য; কোথাও ফুটন্ত গোলাপ—কোথাও সদ্যঃ বিকশিত পদ্মোপরি ভ্রমর বসিয়া মধুপানে মত্ত! এই কৃত্রিম সৌন্দর্য্যের সহিত স্বভাবসৌন্দর্য্য মিশিয়া গিয়াছে; কোন্ ফুলের সৌরভে দিক্ আমোদিত তাহা বুঝা যায় না। হস্তিদন্ত-বিরচিত বহুমূল্য পালঙ্ক শ্বেতকুসুমে সজ্জিত; স্ফটিকবৎ শুভ্র শয্যায় বসিয়া রূপের ছটায় ভানুমতি ত্রিভুবন আলো করিয়া আছে। সখীগণ বসনে ভূষণে অলঙ্কারে কত সাজে তাহাকে সাজাইতেছে—কিছুতেই কাহারও আশা মিটিতেছে না। বণিকবালার প্রধানা সহচরী ফুলের গহনা হাতে করিয়া সুরটমল্লারে তান ধরিল।

ভানুমতি ফুলের গহনা পরিল না। এত আনন্দ উৎসবের মধ্যে থাকিয়াও ভানুমতির মনে সেরূপ আনন্দ নাই; তাহার সুন্দর মুখে কেমন একটা বিষাদের ছায়া! প্রধানা সখী ভানুমতিকে টানিয়া আনিয়া বলিল:—কেন ভাই, ফুলের গহনা পরলে না?

ভানুমতি। ভাল লাগে না; আমার গহনা পরতে ইচ্ছা করে না।

ভানুমতি কণ্ঠ হইতে মুক্তার মালা, হস্ত হইতে হীরক-বলয় ইত্যাদি খুলিয়া সখীর হাতে দিয়া বলিল:—এ সব তুলিয়া রাখ।

সখী বিদ্রূপের ছলে বলিল:—তবে কি যোগিনী সাজবে?

ভানুমতি। মন্দ কি।

সখী। কি দুঃখে?

ভানুমতি। তা জানি না—সাধ আহ্লাদ কি সব সময় ভাল লাগে?

সকলে ভানুমতিকে বিদ্রূপ করিয়া গাহিল :—

গীত।

বিধি সাধে বাদ কি সাধতে পারে
যার এমন জীবন যৌবন।
ভালবেসে শেষে যোগিনীর বেশে
কে ক'রেছে কোথায় জীবন-যাপন।
কত বনফুল সুন্দর অতুল,
তব কবরীর আশে হ'য়েছে আকুল,
(যাবে) অভিমানভরে শুকাইয়া ঝরে,
নাহি পেলে তব প্রেম পরশন।
ঐ দেখ সখি শ্যাম-নীলিমায়,
ভাঙ্গা চাঁদখানি সরমে লুকায়,
অধীর সমীর কেঁদে কেঁদে যায়—
কমলিনী জলে মুদিল নয়ন!

সন্ধ্যার পূর্ব্বে জগন্নাথের হাতে সনাতন ভানুমতিকে যে পত্র পাঠাইয়াছিল, সেই সঙ্গে কয়েকটী সুন্দর ফুলও দিয়াছিল। পত্রোত্তরে ভানুমতির আদেশে জগন্নাথের কি দুরবস্থা হইয়াছিল পাঠকের তাহা বিদিত আছে। জগন্নাথ বিদায় হইবার পর সখীরা সেই ফুলগুলি ফেলিয়া দিতে চাহিয়া-

ছিল। কিন্তু ভানুমতি তাহাতে বাধা দিল। বড় সুন্দর গোলাপ—ফেলিয়া দিতে বণিক-বালার মায়া হইল। তার স্তবকে স্তবকে কি এক অব্যক্ত হাসি লুক্কায়িত—তার সৌরভে কি অপূর্ব্ব মাদকতা—ভানুমতি কিছুতেই সে ফুলের অনাদর করিতে পারিল না। এমনই ফুল কিছুদিন আগে কতবার কে তাহাকে উপহার পাঠাইয়া দিয়াছিল। আদর করিয়া সে ফুলগুলি লইয়া হৃদয়ে চাপিয়া ধরিত। আজও তাহার সেইরূপ ইচ্ছা হইল; মনে মনে বলিল :—'মালি অপরাধী—ফুলের দোষ কি ?' আনমনে ভানুমতি সেই গোলাপের তোড়া লইয়া খেলা করিতে লাগিল। সখীরা তাহার হাবভাব লক্ষ্য করিতেছিল; তাহাদের মধ্যে একজন মুখরা বলিয়া উঠিল :—হাঁ সই, সেই ঝাঁটাখেগো মিনসের ফুল নিয়ে এত সোহাগ কিসের ভাই ?

"কই না ত"—বলিয়া ভানুমতি জড়সড় হইয়া ফুলের তোড়া রাখিয়া দিল। কেহ বুঝিল না—কেহ দেখিল না, তাহার লাজনম্র মুখখানি মুহূর্ত্তের জন্য, কি জানি কেন, কেমন পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল। ভানুমতি কোন দোষ করে নাই—তবু পাছে কেহ কিছু মনে করে এই ভয়ে মনোভাব গোপন করিয়া সখীগণের সহিত আমোদ প্রমোদে যোগ দিল।

সহসা এক দমকা গরম হওয়ার মত রত্নমঞ্জরী আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। রত্নমঞ্জরী চত্বারিংশবর্ষ অতিক্রম করিলেও পোষাকে, অলঙ্কারে ও চালচলনে ষোড়শীকেও পরাস্ত করিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অহঙ্কারে তাঁহার মাটিতে পা পড়িত না। এস্থলে ঐ কথারই একটু বিশদ ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। শ্রেষ্ঠি-পত্নীর চলনভঙ্গিমা বর্ণনার অতীত। তিনি মরালগামিনী নন। তাঁহার চরণের দাপটে বসুন্ধরা

সদাই বিচলিতা। ধনপতির নিদ্রাকর্ষণকালে কক্ষের ভিতরে বা বাহিরে রত্নমঞ্জরী যদি একটু পদচারণ করিতেন তবে শ্রেষ্ঠিবর ভূমিকম্প হইতেছে ভাবিয়া উঠিয়া পড়িতেন। একবার পত্নীর পদভার-নিপীড়িতা প্রশস্ত কক্ষটীর পুনঃপুনঃ প্রকম্পনে শ্রেষ্ঠীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। রত্নমঞ্জরী তখন মল পরিতেন। সে মল তোমার আমার ঘরের মল নহে—সকলকে দেখাইবার জন্য ফরমাইস দিয়া তাহা গড়ান হইয়াছিল। সেই অপরূপ মলের বিকট বাদ্যধ্বনিতে তন্দ্রার ঘোরে ধনপতি শুনিলেন—সজোরে কাঁসর বাজিতেছে! তখন তাঁহার ভূমিকম্পের ধারণাটা রীতিমত বদ্ধমূল হইল। সলম্ফে শ্রেষ্ঠী গৃহের বাহিরে আসিয়া—ভূমিকম্প—ভূমিকম্প—বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। রত্নমঞ্জরী ভ্রুকুটিপূর্ব্বক সম্মুখে আসিয়া আরক্তলোচনে ধনপতিকে কহিলেন:—তোমার মাথা! ভীমরতি ধ'রেছে কি না!

ধনপতি অধোবদনে শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন। এই ঘটনার পর হইতে রত্নমঞ্জরী, কি জানি কেন, আর মল পরিতেন না। আর একবার শ্রেষ্ঠিপত্নী উদ্দাম দিক্-হস্তীর ন্যায় অন্দরমহলে ঘুরিতেছিলেন। তাঁহার গতিপথে একটা বিড়াল ঘুমাইতেছিল। হতভাগ্য সেই নারী-প্রধানার পদতলে পড়িয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল। রত্নমঞ্জরীর ইহাতে বিন্দুমাত্র ক্ষোভ বা দুঃখ হইল না। তিনি একজন ভৃত্যকে আদেশ দিলেন:—আপদ্-টাকে এখনই ফেলিয়া দাও।

এই বিড়াল-বধের ইতিহাসটী পরিচারক-মহল হইতে সহরময় প্রচারিত হইয়া পড়িল। বাজারে গিয়া গল্পের অনেক ডালপালা বাহির হইল। ক্রমে শুনা গেল, শ্রেষ্ঠিপত্নীর এক পদাঘাতে একটা ক্ষিপ্ত মহিষের পরলোক

প্রাপ্তি হইয়াছে! ফলে এই দাঁড়াইল—সওদাগরের বাড়ী ভয়ে কেহ আর চাকরী করিতে যাইত না।

অনেক শিক্ষিত নগরবাসী এই নারীর দাপটের কথা আলোচনা কালে একটা অভিনব সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহারা বলিতেন, বর্ত্তমান উজ্জয়িনী যে স্থানে অবস্থিত তাহারই অনতিদূরে মালবের পুরাতন রাজধানী এক সময় ভারতের এক শ্রেষ্ঠ নগরী ও তীর্থ বলিয়া পরিগণিত ছিল। কালে সেই প্রাচীন নগরী ভূমধ্যে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে। অনুমান—এই সমাধিব্যাপারের অব্যবহিত পূর্ব্বে রাজধানীতে ঘরে ঘরে রত্নমঞ্জরীর অভ্যুদয় হইয়াছিল। তাঁহাদেরই দাপটে বসুন্ধরা দ্বিধা হইয়া নগরীকে গ্রাস করিলেন। এই অদ্ভুত ভৌগোলিক পরিবর্ত্তনের ব্যাখ্যাটী মূর্খলোকে খুব বিশ্বাস করিত।

রত্নমঞ্জরী গৃহে প্রবিষ্ট হইবামাত্র নৃত্যগীত বন্ধ হইয়া গেল। সকলে থতমত খাইয়া একপাশে দাঁড়াইল। ভানুমতি আলুথালুভাবে পালঙ্কে গিয়া উপবেশন করিল। রত্নমঞ্জরী সখীগণকে কহিলেন:—শীঘ্র কর—শীঘ্র কর, আবাগীরে এখনও সব চুপ করে রইলি যে?

শীঘ্র কি করিতে হইবে কেহই তাহা জানে না। ভানুমতির একজন বয়স্যা বলিল:—কি করব রাণীমা?

রত্নমঞ্জরী। নেকিরে কিছুই জানেন না! মরণ আর কি! আরে রাজপুত্র আসছে যে। ভানুমতিকে সাজা।

তখন সাজাইবার ধুম পড়িয়া গেল। ভানুমতিকে লইয়া সকলে পড়িয়া যেন কুস্তীখেলা আরম্ভ করিল। রত্নমঞ্জরী ঘরটার মধ্যে লম্ফঝম্ফ করিতে করিতে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া শুধু খুঁটিনাটি ধরিতে লাগিল। সহসা

রত্নমঞ্জরীর কনিষ্ঠ ধর্ম্মদাস তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন :—কই দিদি, এখন হল না ?

রত্নমঞ্জরী। এই যে ভাই, হল আর কি ; তুমি পাত্রকে নিয়ে এসো।

ধর্ম্মদাস চলিয়া গেলেন। মা মেয়েকে শিখাইতে বসিলেন। বলিলেন :—"রাজপুত্র যদি না হয় তবে অচিরে আগন্তুককে অর্দ্ধচন্দ্র দিতেই হইবে।" কন্যা মায়ের কথা সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিল।

ধর্ম্মদাস এক যুবককে লইয়া গৃহ প্রবেশ করিলেন। রত্নমঞ্জরী আদর অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে বসাইলেন। যুবকের নাম বসন্তসেন, তিনিই দক্ষিণ মালবের বৈজয়ন্তীপুরের এক ক্রোড়পতির পুত্র ; ভানুমতির রূপলাবণ্যের কথা শুনিয়া, তাহার পাণিপ্রার্থী হইয়া উজ্জয়িনীতে আসিয়াছেন। ধর্ম্মদাস যুবকের পরিচয় দিলেন। রত্নমঞ্জরী জিজ্ঞাসা করিলেন :—আগন্তুক কোন্ রাজার পুত্র ?

বসন্তসেন। মা, আমি রাজপুত্র নই। তবে ধন-ঐশ্বর্য্যে আমাদের বংশ রাজবংশ অপেক্ষা হেয় নহে।

রত্নমঞ্জরী নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন :—"তবেই ত গোড়ায় গলদ !" তখন তিনি কন্যার প্রতি লক্ষ্য করিয়া কহিলেন :—"কি বল মা ভানুমতি, তোমার কি মত ?"

ভানুমতি। অমন কোটীপতি ক্রোড়পতি ত ঢের আসে। মামার বিবেচনা করে কাজ করা উচিত।

ধর্ম্মদাস বিরক্ত হইয়া ভগ্নী ও ভ্রাতুষ্পুত্রীকে কহিলেন :—বলিস্ কিরে ! এ তোদের কি ধনুর্ভাঙ্গা পণ ! তোরা যে সব কলির এক এক ভীষ্ম হয়ে উঠলি দেখছি।

ভানুমতী কোন কথা না বলিয়া কক্ষান্তরে চলিয়া গেল; সখীরাও একে একে অন্তর্হিত হইল। রত্নমঞ্জরী কহিলেন :—কি করব নাচার। মেয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ত আর কাজ করা হয় না। এই যে অবন্তীপুরের লক্ষপতির ছেলে, কুমারসেন, এসেছিল ; এক কথায় ভানুমতি তাকে হাঁকিয়ে দিলে। মেয়ে যখন রাজপুত্র ছাড়া বিয়ে করবে না, তখন আমরা কি করব বল।

ধর্ম্মদাসও উদ্ধতভাবে কহিলেন, :—তোমরাই ত মেয়েটাকে এই রকম হালুমবাজ করে তুলেছ।

রত্নমঞ্জরী ভৎর্সনা করিয়া উত্তর করিলেন :—তোমার কাছে আমি আমার কাজের জবাবদিহি করতে বাধ্য নহি। ধর্ম্মদাস, এখন থেকে তুমি সাবধানে কথা কইবে।

রত্নমঞ্জরী পদভরে কক্ষটী কাঁপাইয়া পবনের ন্যায় ভীমবেগে প্রস্থান করিলেন। ধর্ম্মদাসের লজ্জায় অধোবদন হইল ; অপমানে জর্জ্জরিত হইয়া বসন্তসেন সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার হৃদয়ে প্রতি-হিংসাগ্নি সহস্র জিহ্বা বিস্তার করিয়া লক্‌লক্ জ্বলিয়া উঠিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পথের ধারে একটী পান্থশালা। সরাই-রক্ষকের নাম শিবরাম শর্ম্মা। সরাইএ যেমন নানাজাতীয় লোক আইসে, ব্রাহ্মণও সেইরূপ বহুরূপী। কখনও হাড়ের মালা পরিয়া, রক্তচন্দনের ফোঁটা কাটিয়া, রুদ্রাক্ষ ঝুলাইয়া, ঘোর তান্ত্রিক হইয়া করণ-কারণ করে—কখন শিখায় ফুল, গলায় কণ্ঠি, গায়ে নামাবলী দিয়া বৈরাগী সাজিয়া 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' অথবা 'ভজ চৈতন্য' 'জপ চৈতন্য' করিয়া থাকে—কখনও বিভূতি-অঙ্গে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে কটমট করিয়া সূর্য্যের পানে চাহিয়া অগ্নির উপাসক বলিয়া আস্ফালন করে। সকলেই জানে ব্রাহ্মণ বাতিকগ্রস্ত। সর্ব্বধর্ম্মী হইয়াও তন্ত্রের প্রতিই শর্ম্মার অনুরাগটা কিছু অধিক। আর এই বিষয়ের চর্চ্চা করিতে গিয়া তাহার একটা মুদ্রাদোষ হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণের কথার মাত্রা—ভৈরবীচক্র। শিবরাম বিরাট্ মূর্খ—কখনও সে লেখাপড়া শিখে নাই, তথাপি সে বড় বড় পণ্ডিতদিগের সহিত তর্ক করিতেও ভয় পায় না। শিবরাম অনেক সময় জ্যোতিষী বলিয়া আপনার পরিচয় দেয়। সে করকুষ্ঠী-গণনায় সিদ্ধ। যে কেহ পান্থশালায় আসে ব্রাহ্মণ প্রথমেই তাহার ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান বলিতে থাকে। শিবরামের সুর তাল জ্ঞান নাই—সে গান গাহিতেও জানে না। কিন্তু সে একটা ভাঙ্গা তাম্বুরা লইয়া মধ্যে মধ্যে গা গা রে সা করিয়া চীৎকার করে। একবার একজন লোক সেই গান শুনিয়া তাহাকে ঠাট্টা করিয়াছিল। ব্রাহ্মণ ইহাতে বিষম চটিয়া তাহাকে তাম্বুরা ছুঁড়িয়া প্রহার করে। মোটের উপর শিবরাম

মন্দ লোক নহে। সরাইয়ে যাহারা গিয়া দিন বা রাত্রিযাপন করে—শিবরাম তাহাদের পক্ষে বড়ই প্রিয় সঙ্গী।

আজ কয়েক দিন হইতে সরাইয়ে কাহারও আমদানি নাই। ব্রাহ্মণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। দুঃখ কষ্টের সময় সে তাহার ভৃত্য সদানন্দের সহিত কথাবার্ত্তা কহিত। সদানন্দ শিবরাম অপেক্ষাও মূর্খ ও অজ্ঞ; তাহাতে আবার সে প্রায় বধির। শিবরাম সদানন্দকে ডাকিয়া বলিল :—সদা রে, বলব কি, ভৈরবী-চক্র, এত বড় উজ্জয়িনীটে কি ওজড় হয়ে গেছে? এক বেটাও ভৈরবী-চক্র, ভুলে আজ তিন দিনের ভেতর এ দিক মাড়ালে না। ভৈরবী-চক্র, এখন উপায় কি? কিছু বুঝলি সদা, ভৈরবী-চক্র?

সদানন্দ। আজ্ঞে কতক কতক বুঝেছি—আর একবার বল্লেই হয়।

শিবরাম। কি আপদ্, ভৈরবীচক্র! বল্‌ছি কি এক বেটাও আর এ দিকে মাড়ায় না কেন ভৈরবীচক্র? দেশে কি মড়ক হয়েছে?

সদানন্দ। সংক্রান্তির আর কয় দিন দেরী আছে ঠাকুর?

শিবরাম। দূর বেটা! সংক্রান্তি কি রে?

সদানন্দ। আজ্ঞে প্রভু, চৈত্র সংক্রান্তিতেই ত চড়ক হয়ে থাকেন?

শিবরাম। না—বেটা আমায় জ্বালালে দেখ্‌ছি! ওরে গাধা, চড়ক নয় মড়ক! বল্‌ছি কি একটা লোকও ত আর এ দিকে আসে না, দেশশুদ্ধ কি মরেছে?

সদানন্দ। তা এতক্ষণ বলেন নি কেন প্রভু! আমি দেখ্‌ছি।

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সদানন্দ প্রস্থান করিল। শিবরাম যে যে দেবতার উপাসনা করে সকলকেই অল্প বিস্তর গালি দিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে শিবরাম শুনিল বাহিরে একটা বিষম গোল হইতেছে। সে উঠিয়া দাঁড়াইল। পরক্ষণেই দেখিল সদানন্দ সজোরে তিন চারি জন ব্যক্তিকে টানাটানি করিয়া লইয়া আসিতেছে; আর তাহারা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতেছে। তাহাদের মধ্যে একজন বড় ভীতু, দুর্ব্বল ও দুঃখী। সে কাঁদিতে কাঁদিতে সদানন্দের পায়ে ধরিয়া বলিতেছে:— দোহাই বাবা, আমি বড় গরীব; কিছুই নাই—এই ভাঙ্গা নস্যদানিটী আর ছেঁড়া পৈতাটী ছাড়া অন্য কিছু সম্বল নাই। যদি ইহাতে তোমার ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় এই লও বাবা, আমায় ছাড়িয়া দাও।

ভীত ব্রাহ্মণের স্থির বিশ্বাস হইয়াছে তাহাকে ডাকাতে ধরিয়াছে। ভয়ে ব্রাহ্মণ ইষ্টমন্ত্র ভুলিয়া গেল। শিবরামের সেই ফোঁটাকাটা বিশাল দেহখানি দেখিয়া পথিক বুঝিল ঐ ব্যক্তিই দলপতি! তখন সে জোড়হাত করিয়া শিবরামকে কহিল:—সর্দ্দার মহাশয়, আমার কিছু নাই—প্রাণে মারিবেন না!

শিবরাম এই দৃশ্য দেখিয়া বলিল:—একি সদানন্দ!

সদানন্দ। প্রভু, আপনি বলছ, লোক আসে না; তাই এদের ধরে আনলুম। আপনি এদের রাখ, আমি আবার একদল নিয়ে আসি!

শিবরাম। আরে বেটা মূর্খ ভৈরবীচক্র, এ কি করেছিস্! হাতে হাতকড়ি পরবে যে রে বেটা সদা পাঁটা, ভৈরবীচক্র!

সদানন্দ। কেন প্রভু?

শিবরাম। এরা যে রাস্তার লোক!

সদানন্দ। তবে আপনি কোথাকার লোক চাও ঠাকুর?

শিবরাম। দূর বেটা! যা, তোকে কিছু কর্‌তে হবে না!

সদানন্দ বিমর্ষ হইয়া চলিয়া গেল। শিবরাম আগন্তুকদিগের নিকট মার্জ্জনা চাহিয়া তাহাদের বিদায় দিল। সেই নীরিহ ব্রাহ্মণ মুক্ত হইবামাত্র ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল; ভাবিল, জগদম্বা ডাকাতের মুখ হইতে এ যাত্রা তাহাকে রক্ষা করিলেন!

গোলমাল থামিবার পর শিবরাম দেখিল একটা আমীরওমরাহ গোছ হোমরাও চোমরাও ব্যক্তি সরাইয়ে আসিতেছে। ব্রাহ্মণ একগাল হাসি হাসিয়া টিকিটি বেশ চাড়া দিয়া তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য অগ্রসর হইল। আগন্তুক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন:—সরাইয়ের মালিক কে?

শিবরাম হাতে পৈতা জড়াইয়া যুবকের মস্তকের উপর কর ঘুরাইতে ঘুরাইতে বিড় বিড় করিয়া কতকগুলা মন্ত্র পড়িয়া বলিল:—আসুন মহারাজ, আমারই এই কুঁড়ে ভৈরবীচক্র। যোগবলে আজ আপনার আগমন হবে জানতে পেরে, বলব কি ভৈরবীচক্র—বাড়ীটি খালি করে রেখেছি। পাছে মহারাজের কোন অসুবিধা হয় এই জন্য, ভৈরবীচক্র—পূর্ব্বাহ্নেই সমস্ত আয়োজন করা হয়েছে। ব্রাহ্মণ টিকি হইতে একটী করবী ফুল খুলিয়া যুবকের হাতে দিয়া বলিল:—মায়ের আশীর্ব্বাদী ফুল বাবা, আপনার জন্যেই ভৈরবীচক্র—রেখেছিলাম। এখানে সিদ্ধেশ্বরী কালী আছেন। বেটী আমায় বড় ভালবাসে—ভৈরবীচক্র! নিশিয়েতে মায়ে পোয়ে নিরালায় বসে কত কথা কই। এক স্বস্ত্যয়নে সর্ব্বরোগের শান্তি করতে পারি বাবা ভৈরবীচক্র! মহারাজের পরিচয় কি বাবা?

বলা বাহুল্য পরিচ্ছদাদির পারিপাট্য ও চেহারা দেখিয়াই শিবরাম আগন্তুককে ধনবান্ বলিয়া চিনিয়াছিল।

আগন্তুকের সহিত পাঠকের ইতিপূর্ব্বেই পরিচয় হইয়াছে। ইনিই

দক্ষিণ মালবের বসন্তসেন ; ভানুমতির নিকট প্রত্যাখ্যাত হইবার পর হইতে একটা ভয়ঙ্কর অভিসন্ধি লইয়া ঘুরিতেছেন। শিবরামের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া তিনি বুঝিলেন, লোকটা বাতুল হইলেও তাঁহার পক্ষে কাজের হইতে পারে। তখন তিনি একটী স্বর্ণমুদ্রা দিয়া ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিলেন। শিবরাম এই আশাতীত দক্ষিণা পাইয়া "রাজন্, তব যশো-জ্যাতি—ভৈরবীচক্রে, শরচ্চন্দ্র-মরীচিবৎ" বলিয়া মহানন্দে নৃত্য আরম্ভ করিল।

যুবক কহিলেন :—ঠাকুর, সর্ব্বাগ্রে স্নানের উদ্যোগটা করে দাও।

শিবরাম—"যে আজ্ঞা—ভৈরবীচক্র"—বলিয়া সজোরে একটা শাঁখ বাজাইল। বলা বাহুল্য, সদানন্দকে শীঘ্র ডাকিবার জন্যই মধ্যে মধ্যে এই মঙ্গলবাদ্য বাজিত।

শঙ্খধ্বনির সঙ্গে সঙ্গেই সদানন্দ হাজির। শিবরাম তাহাকে বলিল :—ওরে বেটা—ভৈরবীচক্র, শীঘ্র সর্ষপ তেল নিয়ে আয়।

সদানন্দ বেগে প্রস্থান করিল। শিবরাম রন্ধন-শালার দিকে চলিয়া গেল। বসন্তসেন একাকী বসিয়া আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন—'একটা সামান্য বণিক বালা মালবরাজের শ্রেষ্ঠ জায়গীরদারকে অপমান করলে ? এখনও মাথার উপর চন্দ্র সূর্য্য উঠছে, সৃষ্টি এখনও রসাতলে গেল না ?'

ঠিক এই সময় পশ্চাৎ হইতে অবন্তীপুরের কুমারসেন বিকট হাসি হাসিয়া কহিলেন :—যাবে—যাবে—সে দিনের আর দেরী নাই। মণি-কাঞ্চন যোগ হয়েছে। এইবার আগুন জ্বলবে। সে আগুনে ভানুমতি দগ্ধ হবে—উজ্জয়িনার গর্ব্বিত শ্রেষ্ঠিবংশ পুড়ে ছাই হয়ে যাবে!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বসন্তসেন স্থির করিয়াছিলেন স্বদেশবাসী কাহাকেও এ অপমানের কথা জানিতে দিবেন না। এইজন্য কুমারসেনের কথা শুনিয়া প্রথমে তিনি শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন; কিন্তু পরক্ষণেই যখন বুঝিলেন কুমারও তাঁহার ন্যায় প্রত্যাখ্যাত, অধিকন্তু তাঁহার নিকট সাহায্যও পাওয়া যাইবে, তখন সঙ্কোচ গিয়া তাঁহার মনে সমবেদনার উদয় হইল। এই দুর্জ্জয় প্রতিহিংসা-সাধনব্যাপারে দুই বন্ধু পরস্পরে সহোদরবৎ ঐক্য হইয়া কার্য্য করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

কুমারসেন কহিলেনঃ—সেই মদোন্মত্তা গর্ব্বিতা যুবতীর দম্ভের মস্তকে পদাঘাত করিতে হইলে, একটা নিঃস্ব ব্যক্তিকে রাজপুত্র সাজাইয়া কোন কৌশলে তাহার সহিত ভানুমতির বিবাহ দিয়া দিতে হয়। তা'হলে বণিক-বালা সারাজীবন তুষানলে দগ্ধ হবে—আর আমরা তার দুর্দ্দশা দেখে পৈশাচিক নৃত্য ক'রে বেড়াব! বন্ধু, তোমার কি মত?

বসন্তসেন। পাপ একমুখীই হয়ে থাকে—শয়তান যখন ঘুমন্ত হৃদয়টাকে জাগিয়ে তোলে তখন তার উদ্ভাবনী-শক্তি দেখে বিশ্ব-জগৎ স্তম্ভিত হয়ে যায়। প্রতিহিংসার যে পথ তুমি ধরেছ—আমিও ঠিক সেই পথের পথিক!

কুমারসেন। কিন্তু ভায়া, একটা সুচতুর লোক চাই; যাকে তাকে ধ'রলে হবে না; যে-সে একার্য্যে প্রবৃত্ত হ'তে সাহস ক'রবে না!

বসন্তসেন। তেমন লোক পাওয়া কঠিন বটে, কিন্তু পেতেই হবে; মৃত্যু পণ!

কুমারসেন। চেষ্টা করেছ কি?

বসন্তসেন। এইবার ক'রব। এই সরাইয়ের মালিকটা বাতিকগ্রস্ত হলেও আমার বোধ হচ্ছে সে একটা লোক জোগাড় ক'রে দিতে পা'রবে। তার সঙ্গে কথা কইব।

রন্ধনাদির বন্দোবস্ত করিয়া শিবরাম বাহিরে আসিয়া দেখিল, আবার এক শাঁসাল রকম মক্কেলের আমদানী হইয়াছে। ব্রাহ্মণ তখন মহানন্দে দশমহাবিদ্যার নাম করিতে করিতে কুমারসেনের সম্মুখীন হইয়া তাঁহার স্তুতিগান আরম্ভ করিল এবং স্বর্ণমুদ্রা প্রণামীর আশায় পুনঃ পুনঃ হস্ত প্রসারিত করিতে লাগিল। বসন্তসেনের ইঙ্গিতে কুমারসেন ব্রাহ্মণের অভীষ্ট সিদ্ধি করিলেন। আহ্লাদে আটখানা হইয়া শিবরাম চক্ষে সরিষাফুল দেখিতে লাগিল। পরে আগন্তুকদ্বয়ের পরিচয় পাইয়া ব্রাহ্মণ মনে করিল—নিশ্চয় এ দেবতার দয়া! সে মোটা গলায় গাহিল :—
"আজ আমার ঘরে দেখে তারা তারা মলিন হ'য়েছে!"

ব্রাহ্মণের ধর্ম্মের বাতিক দেখিয়া দুই বন্ধু তাহাকে 'স্বামীজি' বলিয়া সম্বোধন করিল। এ নূতন উপাধিতে ভূষিত হইয়া শিবরামের বড়ই স্ফূর্ত্তি হইল। অনেক কথাবার্ত্তার পর বসন্তসেন বলিলেন :—স্বামীজি, ধনপতি সওদাগরের নাম শুনেছ?

শিবরাম একটু মুচ্‌কি হাসিয়া কহিল :—শর্ম্মার অজানা এ ব্রহ্মাণ্ডে কি আছে বলুন--ভৈরবী-চক্র! যার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় নেই, ধ্যানে তাদের ভৈরবী-চক্র দেখতে পাই। ধনপতির চেয়ে এ অঞ্চলে, ভৈরবী-চক্র, তার চাঁদধরা মেয়ের নামটাই খুব বোল বোলাও!

কুমারসেন। তুমি তাহলে ভানুমতির পণের কথা সব জান?

শিবরাম। বল্লুম ত বাবা ভৈরবী-চক্র, ধ্যানে সব ধরতে পারি?

বসন্তসেন তখন সংক্ষেপে তাঁহাদের প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারটা বলিলেন। শুনিয়া শিবরাম অনেকক্ষণ নাকটিপিয়া ধ্যাননেত্রে বসিয়া রহিল। পরে বলিল:—ঠিক হয়েছে—মরবেন আর কি, ভৈরবী-চক্র! অনুমতি করেন ত, ভৈরবী-চক্র, এখনই ক্রিয়ায় বসি!

কুমারসেন কহিলেন:—ঠাকুর, একটা বেশ খেলোয়াড় লোক জোগাড় করে দিতে পার? খরচ আমরা দেব। সে গিয়ে শুধু ভানুমতিকে বিয়েটা করে আসবে! কি বল ঠাকুর পারবে?

শিবরাম। খুব—খুব, ভৈরবী চক্র! পণ্ডিত—খেলোয়াড়—কিন্তু ঘরে নেইক অষ্টরম্ভা! দেখেছ কি বাবা ভৈরবী-চক্র! গরীবের এ আস্তানাটা হল সিদ্ধপীঠ! দায়ে পড়লেই ভৈরবী-চক্র, সবাইকে এখানে আসতে হয়। এই খানিক আগে সনাতন ভানুমতিকে পাবার একটা তুক-তাক জানতে এসেছিল। কি আর বলব ভৈবরী-চক্র, ক্রিয়াতে বসতে না বসতেই মহারাজদের আবির্ভাব!

দুই বন্ধুর পৈশাচিক হাস্যধ্বনিতে নির্জ্জন পান্থশালা কাঁপিয়া উঠিল।

বসন্তসেন ব্রাহ্মণকে স্নানের বন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্য পুনরায় অনুরোধ করিলেন। শিবরাম বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিল:—সে কি ভৈরবী-চক্র! সদানন্দকে ত একথা অনেক পূর্ব্বে বলেছি! বেটা গেল কোথা, তেল আনতে গিয়ে নিরুদ্দেশ!

এমন সময় সদানন্দ খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে কোঁচড়ে করিয়া কতকগুলা কি লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। শিবরাম বিষম চটিয়া বলিল:—হাঁরে সদা!

সদানন্দ। আজ্ঞে হুজুর!

শিবরাম। এত দেরী কেন ভৈরবী-চক্র ?

সদানন্দ। কি করি ঠাকুর, গঞ্জ থেকে ছুটে আসছি—গাছ থেকেও আছাড় খেলুম!

শিবরাম। গঞ্জেই বা গেলি কেন—গাছেই বা উঠলি কি জন্য ভৈরবী-চক্র ?

সদানন্দ। আজ্ঞে মশাই, তাড়াতাড়ি গাছ থেকে বেল পাড়তে গিয়ে পড়ে গেছি। আর এ বাজারে কচ্ছপ না পেয়ে ছুটে গঞ্জের হাটে গেলুম। সেখানেও নেই! কি করি কচ্ছপের বদলে গেঁড়ি আর গুগলি আনলুম। এই নাও প্রভু!

সদানন্দ কোঁচড় হইতে কতকগুলা বেল আর একরাশ গেঁড়ি গুগলি ঢালিয়া দিল।

শিবরাম অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলিল :—ওরে বেটা পাঁটা। এসব তোকে কে আনতে বল্লে ভৈরবী-চক্র ?

সদানন্দ কিছু আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল :—তবে তুমি কি বলেছ! আমি ত জানি আপনি বল্লে কচ্ছপ বেল!

শিবরাম। নারে মূর্খ ভৈরবী-চক্র—আমি বল্লুম—সর্ষপ তেল!

অপ্রতিভ হইয়া শিবরাম আগন্তুকদ্বয়কে বলিল :—আপনারা অধীর হবেন না ভৈরবী চক্র, কি করি বলুন ভৃত্যটা একটু বধির! এই দেখুন না শাঁখ বাজিয়ে ওকে ডাকতে হয়। ভৈরবীচক্র! বেলা ঢের হয়েছে। আপনারা আমার সঙ্গে আসুন ভৈরবী-চক্র। আমি স্নানাহার করিয়ে আনি। তারপর আবার আপনাদের জন্যই ক্রিয়া করতে হবে।

কুমার ও বসন্তসেন স্বামীজির সহিত প্রস্থান করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সোনার মার বড় কষ্ট। সে ছেলের জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া সারা হইয়া গিয়াছে। সনাতন আর পেট ভরিয়া খায় না—ভাল করিয়া কথা কহে না—ডাকিলে সাড়া দেয় না। তিনদিন সে বাড়ী আসে নাই। বুড়ী জগন্নাথকে তাহার সন্ধানে পাঠাইয়া দিল—নিজে লাঠি ধরিয়া অনেক কষ্টে সওদাগরের বাড়ী গেল। সে ভাবিয়াছিল, হয়ত ধনপতি তাহাকে ধরিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে। রত্নমঞ্জরী বুড়ীর পরিচয় পাইয়া তাহার অনেক খোয়ার করিল; তাহাকে ভয় দেখাইয়া বলিল :—তার ছেলেকে ধরতে পারলে কুচি কুচি করে কেটে—সেই মাংস কুকুরকে দিয়ে খাওয়ান হবে। সোনার মা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল :—ছেলে আমার অপরাধী—তাকে দয়া করতে বলি না; কিন্তু মা, দেখদেখি এই ভাঙ্গাচুরো হাড় ক'খানা দেখে কি তোমাদের দুঃখ হয় না! আমার দিন গুটিয়ে এসেছে—বয়সে ভেঙ্গে পড়েছি; দুঃখ কষ্টে ভেঙ্গে পড়েছি; তার উপর সোনার চাঁদ জীবনসম্বল সনাতনের এই অবস্থা দেখে দেহে আর পদার্থ নেই—চোখে আর দেখতে পাই না! আমায় মাপ করো মা—ভগবান্ তোমাদের মঙ্গল করবেন।

চোখের জলে বৃদ্ধার কুঞ্চিত গণ্ডদেশ ভাসিয়া যাইতে লাগিল; ভানুমতি সোনার মার অবস্থা দেখিয়া বড়ই ব্যথা পাইল। তাহার মৃণাল চক্ষু দুটী জলভারে টলমল করিতে লাগিল। বালিকা ভাবিল :—বৃদ্ধার এ দুরবস্থা আমিই করিয়াছি। আমারই রূপাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া

উহার পুত্র এখন ছট্‌ফট্‌ করিয়া বেড়াইতেছে! জগদীশ্বর, কেন তুমি আমাকে রূপবতী করিয়াছিলে!

ভানুমতি স্বীয় অঞ্চল দ্বারা সোনার মার চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়া বলিল :—আহা, কেঁদোনা মা কেঁদোনা—তুমি কাঁদলে আমার বড় মন কেমন করে। যাও—বাড়ী যাও; তোমার কোন ভাবনা নাই!

বৃদ্ধা দুই হাত তুলিয়া ভানুমতিকে আশীর্ব্বাদ করিল।

রত্নমঞ্জরী রক্তচক্ষে কন্যার পানে চাহিলেন। মালিনীর প্রতি এত সৌজন্য দেখানটা তাঁহার মতে কিছুতেই উচিত হয় নাই। এরূপ করিলে অর্থের মর্য্যাদা থাকে কই?

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অস্নাত ও অনাহারী সনাতন তিন দিন পর আসিয়া ভগ্নমনে ভগ্নকুটীরের ভগ্নদাওয়ায় বসিয়া একাকী ভাবিতেছে। তাহার আর গৃহে প্রত্যাগমনের ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু কিছু দূর গিয়া তাহার মাকে মনে পড়িল। আর সে অগ্রসর হইতে পারিল না। সনাতন মা ছাড়া জগতে আর কিছুই জানিত না। আজ একটা বালিকার ভালবাসা পাইল না বলিয়া বৃদ্ধা জননীকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে! একটা গাছতলায় বসিয়া যুবক কপালে করাঘাত করিতে লাগিল—কত কাঁদিল—শেষে স্থির করিল, মাকে সঙ্গে লইয়া তীর্থে তীর্থে ঘুরিবে। উজ্জয়িনীতে ভানুমতি আছে—সেখানকার পাহাড়গুলো শুধু পাথরের স্তূপ—নদীতে উত্তপ্ত বালুকার তরঙ্গ—বাতাসে বিষ! সেখানে তাহার স্থান নাই! ধীরে ধীরে সনাতন আবার গৃহের দিকে ফিরিল।

বৃদ্ধা বণিকগৃহ হইতে কতকটা আশ্বস্ত হইয়া কুটিরে আসিয়া দেখিল, রুক্ষ কেশ, মলিন বেশ, সনাতন বসিয়া আছে। তার মুখ শুষ্ক, চক্ষে কালি, কপালে চিন্তার রেখা! সোনার মা ছেলেকে দেখিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বলিল :—কোথা ছিলি বাপ!

সনাতন কাঁদিতে কাঁদিতে মায়ের চরণতলে আছাড় খাইয়া পড়িয়া বলিল :—মা, কেঁদো না; আমায় মাপ কর! আমার দুরাশা দেখে একদিন তুমি আমায় নিয়ে এ দেশ ছেড়ে যেতে চেয়েছিলে; তখন তোমার কথা শুনিনি; আজই চল মা, চলে যাই; কোন তীর্থ স্থানে গিয়ে থাকব। বারাণসীতে ভিক্ষা মেলে, চল সেই খানে যাই।

তোমায় ভিক্ষা করে এনে খাওয়াব, আর তোমার চরণসেবা করে এ তাপদগ্ধ জীবনের সকল জ্বালা জুড়াব।

সোনার মা পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল :—বাবা, মা রক্ষাকালী তোমায় রক্ষা করুন, জগদম্বা তোমায় সুমতি দিন; তা বাবা, তাড়াতাড়ি কি কোন কাজ করতে আছে? দেশ ছাড়াটা কি অমনি সোজা কথা! এই দেখ, তোর বাপের আমলের টিয়া পাখীটে; ঐ পোষা বিড়ালটী; ঐ শালিকের ছানাটা সবে কপ্‌চাতে শিখেছে! আহা, ওরা হল কৃষ্ণের জীব! বিশ্বাস করে কার হাতে দিয়ে যাই বল! তাঁ ছাড়া—তৈজসপত্র লেপ কাঁথা, ধামা চুপড়ী, চরকা—এ সবও ত কম নয়! বলব কি সোনা, ওসব জিনিসের উপর জ্যান্ত মানুষের মত মায়া পড়ে আছে। এ সবগুলোর ত ক্রমে ক্রমে একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

সনাতন। ওসব মরুক—পচুক—উচ্ছন্ন যাক,—যা খুসী হোক—কোন খোঁজে দরকার নেই; যে দেশে ভানুমতির নাম গন্ধ আছে সে দেশে আমায় আর একদণ্ড থাকতে বোলো না। চল মা, আজই যাই।

সোনার মা মনে করিল, ছেলে ভয়ে অমন করিতেছে; তাহাকে সাহস দিবার জন্য বৃদ্ধা বলিল :—ছি বাবা, মার কথা কি অমান্য করতে আছে? আমি যখন তোকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলুম তখন আমার মনে হয়েছিল বুঝি সদাগর তোর ওপর অত্যাচার করবে। তুই আজ তিনদিন না আসাতে বড় ভয় পেয়ে, বাবা, এইমাত্র আমি ভানুমতি ও তার মার সঙ্গে দেখা করে এলুম!

সনাতন। তারপর—তারপর! আহা, বেশ করেছ—বেশ করেছ!

সোনার মা। বুঝে এলুম কোন ভয় নেই!

সনাতন। বটে—বটে! কি রকম—কি রকম!

সোনার মা। পাছে তোকে কিছু বলে—এই জন্য আমি কাঁদতে লাগলুম!

সনাতন। শেষটা কি হল?

সোনার মা। ভানুমতি নিজের কাপড় দিয়ে আমার চোখের জল মুছিয়ে কত করে আমায় বল্লে—কোন ভয় নেই!

সনাতন আবার যেন আশার আলোক দেখিতে পাইল। সে একটু সরল ভাবে শ্বাস ছাড়িয়া বলিল ঃ—বটে—বটে! তা হলে মন্দের ভাল! আমার বোধ হয় ভানুমতির আমার উপর ষোলআনা টান আছে, শুধু লোকলজ্জা-ভয়ে কিছু করতে পাচ্ছে না! কি বল মা, কথাটা ঠিক নয়?

সোনার মা। ও সব কথায় আর কাজ কি ধন?

সনাতন চুপ করিয়া রহিল। সহসা সেইখানে শিবরাম উপস্থিত হইয়া কহিল ঃ—কিরে সোনা, কখন এলি? উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া ব্রাহ্মণ সোনার মাকে জিজ্ঞাসা করিল ঃ—কিগো মাসি, ভাল আছ ত?

সোনার মা। আর বাবা, আমাদের ভাল থাকা! এখন তোমাদের রেখে যেতে পাল্লেই বাঁচি! উপস্থিত, বাবা, বড় বিপদে পড়েছি। আমার সনাতন আজই আমায় নিয়ে এদেশ ছেড়ে যেতে চায়!

শিবরাম। তাও কি কখন হয়? পাগল নাকি—ভৈরবী চক্র!

সোনার মা। বল, বাবা, বল—তাও কি কখন হয়? তুমি ত সব জান বাবা, তোমায় ও ভালবাসে—তুমি একটু ওকে বুঝিয়ে বল।

শিবরাম। আর কিছু বলতে হবে না মাসী, ভৈরবীচক্র! সব বুঝে

নিয়েছি। তুমি ভেবো না মাসী, আমি দিন কতক—ভৈরবীচক্র—সনাতনকে নিয়ে ঘুরিয়ে আনি; তাহলেই ওর মনটা ফিরে যাবে ভৈরবী চক্র!

সোনার মা। তাই কর বাবা, তাই কর!

অধিক কথা না কহিয়া সনাতনের হাত ধরিয়া শিবরাম চলিয়া গেল। যাইবার সময় শিবরাম সনাতনকে বলিল :—আর কি ভৈরবীচক্র, ক্রিয়ার জোরে তোর অদৃষ্টচক্রটা কেমন ঘুরিয়ে দিই দেখ!

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার পূর্ব্বে খুব একপশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে ; এখনও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। থাকিয়া থাকিয়া বিদ্যুৎ চমকিতেছে। জোরে বাতাস বহিতেছে। পল্লী-পথের উভয় পার্শ্বস্থ বৃক্ষরাজিতে অসংখ্য খদ্যোৎ জ্বলিতেছে। উজ্জয়িনীর অনতিদূরস্থ একটা বিজন প্রান্তরে চারিজন ব্যক্তি এই দুর্য্যোগের মধ্যে ভীষণ ষড়যন্ত্রে নিযুক্ত। কথোপকথনকারিগণ সকলেই পাঠকের পরিচিত। শিবরাম সনাতনের সহিত কুমারসেন ও বসন্তসেনের পরিচয় করিয়া দিতেছে। কুমারসেন বিদ্রূপের ছলে শিবরামকে কহিলেন :—“ছল, বল, কৌশল, শঠতা, প্রবঞ্চনা—স্বামীজির দেখছি সকল শাস্ত্রেই সমান অধিকার!” স্বামীজির শাস্ত্রে অধিকার—শুনিয়া শিবরাম গলিয়া গেল। সে কিছু গর্ব্বিত ভাবে উত্তর করিল :—“কি আর বলব, ভৈরবীচক্র, সবই কুলকুণ্ডলিনীর দয়া! তোমাদের শরণাগত দেখে ক্রিয়ার জোরে অঘটন ঘটিয়ে দিলুম। পাত্র যা এনে দিইছি তার আর জুড়ি খুঁজে পাবে না। রূপে কন্দর্প, বিদ্যায় সরস্বতীর বরপুত্র, আর লক্ষ্মীভাগ্যে—বাবাজীরা যা চেয়েছ—তাই—ভৈরবীচক্র—একেবারে ভাঁড়ে মা ভবানী! বল, বাপজীবনেরা, কাজটা ঠিক শাস্ত্রসঙ্গত হয়েছে কি না? সনাতনের নূতন নামকরণ ক’রে, তাকে একটা উদ্ভট দেশের রাজপুত্র সাজিয়ে সদাগরের বাড়ী নিয়ে গেলে, বল্‌ব কি, ভৈরবী চক্র, ফুস্‌মন্ত্রের চোটে একেবারে এস্তকবিস্তি কাবার হয়ে যাবে কি না?” বসন্তসেন ও কুমারসেন সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন—“নিশ্চয়, নিশ্চয়, স্বামীজির কি অসাধারণ শক্তি!” শিবরাম ভাবে বিভোর

হইয়া সটিক মস্তকটী আন্দোলন করিতে লাগিলেন। কুমারসেন সনাতনকে কহিলেন :—"সনাতন ভায়া, কাজটা ঠিক পারবে ত ?"

সনাতন। খুব, খুব ; যাদৃশী ভবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী ! শাস্ত্র-বাক্য কখন মিথ্যা হয় না। দেখনা অদৃষ্টচক্র কোথা দিয়ে কি রকম করে ঘুরে গেল। সনাতন সারাজীবনটা যাকে সাধনা কল্লে, সে কি তাকে ছেড়ে পালাতে পারে ? যাক্, এখন বাজেকথার প্রয়োজন নাই। ঠিক জেনো, সকলেরই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। তোমরা ভানুমতির দুর্দ্দশা দেখতে চাও—তাই হবে। আমার তাকে অর্দ্ধাঙ্গিনী করবার ইচ্ছা—তাই হবে। স্বামীজির সোণাদানার প্রয়োজন—তাই হবে। এখন কাজ করবে চল। আর আমি সনাতন ই-ই—শর্ম্মা এখন রত্নগড়ের যুবরাজ ; নাম সনৎকুমার ! খুব হুঁসিয়ার হ'য়ে কথা কইবে ; উঠতে বসতে কুর্ণিশ চাই ?

বসন্তসেন ও কুমারসেন সহাস্যে সনাতনকে কুর্ণিশ করিলেন। সনাতন বলিল :—চল দাদা, শীঘ্র সরাইয়ে যাই ; একেবারে হাড়ির হাল ; বেশ পরিবর্ত্তনটা আবশ্যক। তারপর মহলা দিব।

"তথাস্তু, ভৈরবী চক্র"—বলিয়া শিবরাম অগ্রগামী হইল। সঙ্গিগণ নানা কথা কহিতে কহিতে তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

নবম পরিচ্ছেদ

সিপ্রাতীরে মহাকালের মন্দির। এখানে মহাকাল নামক শিবলিঙ্গ আছেন। সাধারণে এই লিঙ্গকে 'অনন্তকল্পেশ্বর' বলিয়া থাকে। ইহা একটী পীঠস্থান বলিয়া বিখ্যাত। প্রতি সোমবার মহাকাল কৌষেয় বস্ত্র ও নানালঙ্কারে ভূষিত হইয়া মস্তকে পঞ্চমুখী-মুকুট ধারণপূর্ব্বক ভক্তের পূজা গ্রহণ করেন।

এরূপ সুন্দর ও সুবৃহৎ মন্দির ভারতে অল্পই দেখা যায়। অনুমান তিন শত বৎসর ধরিয়া এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার অপরূপ শিল্পকার্য্য হিন্দু শিল্পিগণের অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচায়ক। ফিরিস্তা নামক প্রসিদ্ধ মুসলমান ইতিহাসে মহাকালের মন্দির সোমনাথের সমতুল্য বলিয়া উল্লিখিত। এক সময়ে ইহার স্বর্ণস্তম্ভ-সমূহ বহুমূল্য হীরামরকত ইত্যাদিতে খচিত ছিল। মন্দিরগর্ভস্থ-বিগ্রহের স্থানে একটী ক্ষুদ্র দীপ জ্বালিলে উহা প্রাচীরখচিত হীরকাদিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া সমস্ত মন্দির-টীকে সূর্য্যালোকের ন্যায় সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিত। এখন আর মন্দিরের সে পূর্ব্ব-বৈভব ও সৌন্দর্য্য নাই। সুলতান আলটামাস ইহার রত্নাভরণাদি কাড়িয়া লইয়াছিলেন। এখনও মন্দিরচূড়ায় সুবৃহৎ স্বর্ণকলস দূর হইতে দর্শকের চিত্ত বিমোহিত করে।

চতুর্দ্দশীর রাত্রি। মহাকালের মন্দিরে আজ মহোৎসব। দলে দলে ভক্তবৃন্দ-দেব দর্শনে আসিতেছে। নাটমন্দিরে নহবৎ বাজিতেছে। অনতিদূরে এক স্থানে বহু লোকের সমাগম হইয়াছে। সকলে বলাবলি করিতেছে—যথার্থই সাধু বটে! এরূপ নিখুঁত গণনা আর

দেখা যায় না। সহসা পাইকগণ আসিয়া জনতা সরাইয়া দিল এবং জ্ঞাপন করিল যে রাণীমা ভাগ্যগণনার্থ সাধুদর্শনে আসিতেছেন। কিয়ৎপরে রত্নমঞ্জরী ভানুমতিকে লইয়া সাধুর নিকটে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিতক্ষেত্রে সাধু আর কেহই নন—আমাদের পূর্ব্বপরিচিত সরাই-রক্ষক সেই শিবরাম শর্ম্মা। ব্রাহ্মণের বেশের আজ বিশেষ পারিপাট্য—গলায় তুলসী, শঙ্খ, স্ফটিক, রুদ্রাক্ষ প্রভৃতির মালা, কপালে রক্তচন্দন, পরিধানে গৈরিক বস্ত্র। শিবরাম স্তিমিত-নেত্রে বসিয়াছিল ; রত্নমঞ্জরীকে আসিতে দেখিয়া একবার তাঁহার প্রতি চাহিয়া দেখিল ; পরক্ষণেই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানমগ্ন হইল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া রত্নমঞ্জরী ডাকিলেন :—"বাবা, একবার কৃপাদৃষ্টি করে আমার এই মেয়েটীকে দেখ এবং কিসে সুপাত্রে পড়ে ব'লে দাও।"

শিবরাম। বলব কি, ভৈরবীচক্র, তোর মেয়ের সঙ্গে রাজপুত্রের বিবাহ হবে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সে রাজপুত্র আপনি এসে দেখা দেবে। তুই নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে যা।

রত্নমঞ্জরী কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ প্রচুর অর্থ দিয়া সাধুকে প্রণাম করিলেন। সম্মুখে সোণা-রূপা দেখিয়া সাধু শিহরিয়া উঠিল এবং সদানন্দকে ডাকিয়া বলিল :—"সদারে, শীঘ্র এই সকল আবর্জ্জনা পরিস্কার কর! কাঞ্চনে আমার কাজ নাই, ও সকল তুই নে।" রত্নমঞ্জরী সাধুর মহত্ত্ব ও উদারতা দেখিয়া বিস্মিতা হইয়া কন্যার সহিত প্রস্থান করিলেন। তখন শিবরাম সদানন্দকে ডাকিয়া তাহার নিকট হইতে রত্নমঞ্জরী-দত্ত অর্থরাশি ফেরত চাহিল। সদা কহিল :—"সে কি ঠাকুর! আপনি ত এই মাত্র আমায় সব দিয়েছ, আবার চাও কেন?"

শিবরাম। ওরে বেটা পাঁটা, আমি তোকে রাখতে দিয়েছিলাম, ভৈরবীচক্র।

সদানন্দ। সে কি ঠাকুর, কথা ফেরাচ্ছ যে! ওই যে মা ঠাকরুণ যাচ্ছে, আমি তা হলে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে আসি?

শিবরাম। আরে থাক্ থাক্ ভৈরবীচক্র! তুই হলি আমার বিশ্বাসী ভৃত্য! তোরও যা—আমারও তা। আচ্ছা, এখন চল গৃহে যাওয়া যাক!

সদানন্দ। তাই বল ঠাকুর!

উভয়ে অল্পবিস্তর বচসা করিতে করিতে সরায় অভিমুখে চলিল। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া শিবরাম যখন দেখিল পথে আর লোকজন নাই, তখন সে সদানন্দকে স্বর্ণমুদ্রাগুলি দিবার জন্য পীড়ন করিতে লাগিল। সদানন্দ কয়েক বৎসরের মধ্যে শিবরামের কাছে একটী পয়সাও পায় নাই, সুতরাং সে মনে মনে স্থির করিয়াছিল, এই কয়টী মুদ্রা লইয়া সে দেশে চলিয়া যাইবে। কিন্তু শিবরাম ছাড়িবার লোক নয়। সে সদানন্দকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিয়া তাহার নিকট হইতে অর্থরাশি কাড়িয়া লইল। সদানন্দ বিকট চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অন্ধকার পথে কোন্ দিকে চলিয়া গেল।

দশম পরিচ্ছেদ

"তুমি একটা আস্ত জড়ভরত ; কাণা মাছির মত দিনরাত এত ভ্যান্‌ভ্যানানি কিসের গা ?"—বলিয়া রত্নমঞ্জরী স্বামীকে তিরস্কার করিলেন। ধনপতি কিন্তু-মিন্তু করিয়া মাটির দিকে চাহিয়া উত্তর করিলেন :—নাঃ—তাই বলছি।

রত্নমঞ্জরী আরো একটু সুর চড়াইয়া বলিলেন :—"বল্‌ছ কি—আমার মাথা! এমন বিপদেও মানুষে পড়ে ? না হয় মেয়ের বিয়ে আমার নাই হবে—তাতেই বা কি এসে যায়! টাকার জোর আছে তার আবার ভয় কিসের ? সবার উপর ড্যাংডেঙ্গিয়ে যাব না ? কার সাধ্য আমায় একটা কথা বলে ?

লাজনম্র বধূটীর মত ধনপতি অতি ধীরে, নতমুখে, তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলীর নখরদ্বয় ঘর্ষণ করিতে করিতে বলিলেন :—"নাঃ—তাই বলছি!"

পত্নী স্বামীর সম্মুখে হাতমুখ নাড়া দিয়া, নথ ঘুরাইয়া সরোষে—"তা বল ; জন্ম জন্ম বল ; ঐ কড়ি বরগা আছে—দেয়াল দরজা আছে—যত পার বল! মিন্‌সের বাহাত্তুরে ধরেছে!"—এই কথা বলিয়া বিরক্তির সহিত প্রস্থান করিলেন।

ধনপতি অধোবদনে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন :—"না, এরা দেখ্‌ছি পৃথিবীটাকে আর রাখলে না, যা খুসী তাই করছে! অত বড় জায়গীর-দারের ছেলে বসন্তসেন—তাকে পছন্দ হল না! যা ভাল হয় করুক বাপু—আমার কথায় কাজ কি ? আদার ব্যাপারী—জাহাজের খবরে দরকার নেই!"

সহসা রত্নমঞ্জরী পুনরায় তথায় আগমন করিলেন। শ্রেষ্ঠিবর তদ্দর্শনে একটু থতমত খাইয়া—ঈষৎ জড়সড় হইয়া—অতি ধীরে—স্বগতের সামিল করিয়া বলিলেন :—"তাই ত—তুমি আবার এলে ?"

রত্নমঞ্জরী। হাঁ—এলুম—তাতে হয়েছে কি ?

ধনপতি। না :—তাই বলছি।

রত্নমঞ্জরী। ও ভাবনা এখন চুলোয় রেখে দাও। রত্নগড়ের রাজপুত্র এসেছে। তোমার বসন্তসেন আর কুমারসেন—সেদিন যাদের ঝাঁটিয়ে দিলুম—তারাই রাজপুত্রকে নিয়ে এসেছে। আনবে নাই বা কেন, রত্নগড়ের রাজা হলেন একটা ইন্দ্র চন্দ্রের সামিল ; কে না তাঁর হুকুমে উঠবে বসবে বল ? এখন এক কাজ কর ; তাদের ডেকে বেশ করে কথাবার্ত্তা কও ; ও রকম ভূতুড়ের মত বসে থাকলে চলবে না ?

ধনপতি। তাইতো!

রত্নমঞ্জরী। এর আবার তাই ত কি ?

ধনপতি। নাঃ—তাই ভাবছি!

রত্নমঞ্জমরী। ভাবনাটা কিসের ?

ধনপতি। তা—তা—বল্‌ছি কি—আমি কি বল্‌তে কি বল্‌ব—তুমি ডাক না ?

ভৃত্য আসিয়া জানাইল—রাজকুমার সদলে বাহিরে অপেক্ষা করিতেছেন, মহারাজের হুকুম হইলেই তাঁহারা ভিতরে আগমন করেন।

ধনপতি উঠিয়া দাঁড়াইয়া স্বীয় যষ্টিটি লইয়া বাহিরের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে ভৃত্যকে কহিলেন :—"ডাকবে বৈ কি—এই তোমাদের রাণীমা রহিলেন !"

ধনপতি বাহিরে আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। রাণীমা গিয়া স্বামীর সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিলেন। ভানুমতিকে ডাক পড়িল—মেয়ে আসিয়া মায়ের অঁাচল ধরিয়া বসিল। মা কহিলেন:—দেখ মা, পদ আর পয়সা—তুই যখন আছে—তখন সবই হ'ল। খুব আপনার মত হ'য়ে কথা কইবে মা! যেমন শিখিয়ে দিইছি—ঠিক সেইভাবে চল্‌বে। উঠতে বসতে, খালি আদায়—খালি আদায়! বুঝলে মা!

ভানুমতি কথা কহিল না—আহ্লাদের হাসি হাসিয়া মায়ের কথার উত্তর দিল।

বসন্তসেন রাজপুত্রকে লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। পাঠকবর্গের বোধ হয় বুঝিতে বাকি নাই যে রাজপুত্রই আমাদের সেই পরিচিত সনাতন। এখন হইতে তাহাকে যুবরাজ সনৎকুমার বলিয়া জানিতে হইবে। সনৎকুমার সুপুরুষ, তাহাতে আবার বসন্তসেন ও কুমারসেন-দত্ত পরিচ্ছদাদির পারিপাট্যে প্রকৃতই তাহাকে রাজপুত্রের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। যুবরাজের হস্তে অপূর্ব্ব হীরক অঙ্গুরীয়ক—কণ্ঠে মতির মালা—কর্ণে কুণ্ডল—মস্তকে মণিরত্নখচিত মূল্যবান্ উষ্ণীষ। গৃহের সাজসজ্জা আসবাব-পত্রাদি দর্শনে কুমার কিয়ৎক্ষণের জন্য কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিল। তাহার মনে হইল, সে বুঝি একটা কুহকের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। ক্ষণিকের জন্য তাহার চক্ষে পৃথিবীর আলো নিভিয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই প্রবল পাপলিপ্সা জাগরিত হইয়া তাহার জড়তা দূর করিয়া দিল। প্রকৃতিস্থ হইয়া সে দেখিল, ভানুমতি অনিমেষ নয়নে তাহার প্রতি চাহিয়া আছে। সে দৃষ্টি বড়ই মর্ম্মস্পর্শী—কুমার একদৃষ্টে সেই সৌন্দর্য্য প্রতিমা দেখিতে লাগিল।

দশম পরিচ্ছেদ

রত্নমঞ্জরী মহা সমাদরে যুবরাজ সনৎকুমারকে রত্নাসনে বসাইলেন। বসন্তসেন ও কুমারসেন কুমারের নিকটে বসিয়া কুমারের নিষ্কলঙ্ক চরিত্র ও অতুল ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দিতে লাগিল। শ্রেষ্ঠিপত্নী তৎশ্রবণে গলিয়া গেলেন। ভাবে ডগমগ হইয়া সনৎকুমার তাহার সরস দন্তপংক্তি ঈষৎ বিকশিত করিয়া সে প্রশংসা-গীতের নীরব-প্রতিধ্বনি জ্ঞাপন করিল।

সে দিনটা এইভাবে কাটিয়া গেল। সরলা বালিকা না জানিয়া, জলে কি আগুনে—সুখে কি দুঃখে—কোথায় ঝাঁপ দিল তাহা সে বুঝিতে পারিল না। বসন্তসেন ও কুমারসেন প্রতিহিংসার তীব্র অনল প্রজ্বালিত করিয়া আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল। গর্ব্বিতা রত্নমঞ্জরী রাজজামাতা পাইবেন বলিয়া আস্ফালনে উজ্জয়িনী আলোড়িত করিতে লাগিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

যুবরাজ সনৎকুমারের পার্শ্বচরভাবে জগন্নাথ সদাগরগৃহে আসিয়াছে। জগন্নাথকে পাঠক ইতিপূর্ব্বে আর একবার দেখিয়াছেন। সনাতন জগন্নাথের হাতে পত্র ও ফুল দিয়া কিছুদিন পূর্ব্বে ভানুমতির নিকটে পাঠাইয়াছিল। তাহার ফলে ভানুমতির এক পরিচারিকা কর্ত্তৃক তাহার কিরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছিল পাঠকবর্গ তাহাও জ্ঞাত আছেন। এখানে আসিবার পর সেই পরিচারিকার সহিত জগন্নাথের ক্রমে ক্রমে বেশ ঘনিষ্ঠতা হইতে লাগিল। পরিচারিকার নাম নির্ম্মলা। নির্ম্মলা যুবতী—কৃষ্ণবর্ণা—স্থূলাঙ্গী! চেহারাটী বেশ থামটীর মত! আর জগন্নাথ প্রায় বৃদ্ধ—কুব্জ—শীর্ণ ও এক-চক্ষুহীন! তাহাতে আবার লম্বা, আকাশ-প্রদীপের মত! এই চেহারা লইয়া সে তিনবার দারপরিগ্রহ করিয়াছিল; কিন্তু তিনজনই তাহাকে ফাঁকি দিয়া পলাইয়াছে। বহুদিন চেষ্টা করিয়াও জগন্নাথের ভাগ্যে আর চতুর্থ পত্নী জুটিল না। একজন দরিদ্র গ্রামবাসীকে কিঞ্চিৎ অর্থ দিয়া তাহার কন্যাকে লইবার জন্য জগন্নাথ স্থির করে। কিন্তু মেয়ের মত হইল না; সে অম্লানবদনে জগন্নাথের মুখের উপর বলিয়া দিল:—"পোড়া কপাল আর কি! মিন্‌সের নাগাল পাবার যো নেই—ওকে আবার বিয়ে করে! তবু কুঁজো হয়ে এই; সোজা হলে না জানি কি হত!" এই ব্যাপারের পর জগন্নাথ আর বিবাহের চেষ্টা করে নাই। সে এখন:—একাকী গৃহসন্ত্রক্তঃ পাণিপাত্রো দিগম্বরঃ!

জগন্নাথ নির্ম্মলার রূপে মুগ্ধ। চাঁদীর আশায় নির্ম্মলাও বৃদ্ধের অনুরাগী। মূর্খ জগন্নাথ তাহা বুঝিল না। প্রেম ও চাঁদীতে বেশ মাখামাখি হইয়া উঠিল। বেচারা জগন্নাথ যা কিছু সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল এবং বসন্ত-সেন ও কুমারসেনের নিকট উৎকোচরূপে যাহা পাইয়াছিল—সমস্ত সেই শ্রীপদে ঢালিয়া দিল। নির্ম্মলা সেই দীর্ঘ কঙ্কাল কয়খানা লইয়া দিব্য খেলা খেলিতে লাগিল।

একদিন কথাচ্ছলে নির্ম্মলা জগন্নাথকে জিজ্ঞাসা করিল:—বলি ব্যাপারটা যে কেমন কেমন বোধ হচ্ছে?

জগন্নাথ। কিসের ব্যাপার নির্ম্মলে?

নির্ম্মলা। এই তোমার!

জগন্নাথ। কেন—কেন, আমি ত তোমার ঐ শ্রীচরণের দাসানুদাস হয়ে আছি! একেবারে পাপোষের সামিল—যার নাম—ধূলো—ধূলো! কি বলব নির্ম্মলে, ঘুমিয়ে দেখি তোমার ভোমরা চোখে কাজল পরিয়ে দিচ্ছি, খোঁপার ভেতর বসরাই গোলাপের ঝাড় বসাচ্ছি; এত ভালবাসি নির্ম্মলে! তবুও যদি ক্রটী হয়ে থাকে তাহলে কি আর বলব—"অপরাধ করিয়াছি, হুজুরে হাজির আছি, ভুজপাশে বাঁধি কর দণ্ড!"

নির্ম্মলা বিদ্রূপের ছলে জগন্নাথকে একটী ছোট কিল মারিয়া সহাস্যে বলিল:—পাগল, তা নয়—তা নয়; দুদিন আগে ত মালির খানসামা ছিলি—এর মধ্যে রাজকুমারের বিদূষক হ'লি কেমন করে?

জগন্নাথ। কি আর বলব—গুণে; মালি বেটা যে অমন চিঠি

লিখবে তা কি জানি! এখান থেকে বেরিয়ে আর সে মুখোও হলুম না। কি আর বলব প্রিয়ে, আগুন কখন ছাইচাপা থাকে না। পথেই রাজপুত্র আমার গুণে মুগ্ধ হয়ে আমায় লুফে নিলেন। এখন ত আমি মন্ত্রীর সামিল; এর পরই—রাজা; তা হলেই, তুমি রাজরাণী!

যুবরাজ সনৎকুমার এই সময় জগন্নাথের অন্বেষণে সেইখানে আগমন করিল। নির্ম্মলা তাঁহাকে দেখিয়াই তথা হইতে পলাইল। যাইবার সময় সে জগন্নাথকে আদর করিয়া—আসি—বলিয়া গেল। জগন্নাথ মনে মনে বলিতে লাগিল:—"না—আর বাঁচলুম না! কি মিষ্ট সম্ভাষণ! নির্ম্মলাকে পাবার আগেই দেখছি আহ্লাদে আমার শেষ হ'য়ে যাবে!"

যুবরাজ আসিবামাত্র জগন্নাথ তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া আস্তে আস্তে বলিল:—কি ভায়া, খবর কি?

যুবরাজ। এ দিকে কেউ আছে না কি?

জগন্নাথ। কেউ না—তেপান্তর মাঠ!

যুবরাজ। তা ভায়া, এখন উপায় কি বল দেখি!

জগন্নাথ। কিসের উপায়?

যুবরাজ। এই পেটটার! অনাহারে ত মরে গেলুম; বেটারা সব পোলোয়া কালিয়া মাথা মুণ্ড—কত কি খেতে দিচ্ছে! কিন্তু দাদা, বলব কি, সে ওজন করা—এই এতটুকু—এতটুকু! তাতে এই মশকের মত পেটটার কি হবে বল! আর আমার চতুর্দ্দশ পুরুষও ও সব খায় নি! কাঁশি কাঁশি পান্তা নইলে কি পেট ভরে!

জগন্নাথ। তার আর ভাবনা কি? তোমার বেলা ঐ বড় মানুষি

পোলোয়া কালিয়া—আমায় কেবল পান্তা ভাত আর চাল্‌তার অম্বল! এখনও ঘরে একগামলা মজুত; কেউ কোথাও নেই; ইচ্ছা হয় ত এই বেলা পার কোরে দেবে চল!

একগাল হাসি হাসিয়া যুবরাজ জগন্নাথের ঘরে প্রবেশ করিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

যুবরাজ সদাগরগৃহে আসা পর্য্যন্ত বসন্তসেন ও কুমারসেন তাঁহারই পার্শ্বচরের ন্যায় তথায় রহিয়াছেন। একদিন ভানুমতির উদ্যানে দুই বন্ধুতে পদচারণ করিতে করিতে কথোপকথন করিতেছিলেন :—

বসন্তসেন। দেখ ভাই, অনেক কাট-খড় খরচ করে অঘটন ঘটিয়েছি—এখন ভাবছি শেষটা না ফেঁসে যায়?

কুমারসেন। আমি ভাবছি, আমার অমন হীরার আংটি, আর তোমার অমন অপরূপ নস্যদানি—তা ছাড়া ভাল ভাল পরিচ্ছদাদি বেটা না বাজেয়াপ্ত করে!

বসন্তসেন। করে যদি তাতেই বা কি—তবু ভানুমতিকে জব্দ করতেই হবে। কিন্তু একটা লোককে ভয় হচ্ছে; ঐ ধর্ম্মদাস মামা! আমাদের ঘটকালি আর রাজকুমারের হাবভাব দেখে লোকটার মনে কেমন সন্দেহ হয়েছে। কাল সওদাগরের সঙ্গে তার কি কথা হচ্ছিল। যা হোক, আজ কোন উপায়ে বিবাহটা দিয়ে ফেলতেই হবে। আমি উপায়ও ঠিক করেছি।

এমন সময় রত্নমঞ্জরী—ধর্ম্মদাস, যুবরাজ ও ভানুমতির সহিত তথায় আগমন করিলেন। ভানুমতি যুবরাজের সহিত একটু দূরে দাঁড়াইয়া অনুচ্চস্বরে কথা কহিতে লাগিল। রত্নমঞ্জরী ধর্ম্মদাসকে কহিলেন :—ভাই, কি সুন্দর সোনার চাঁদ রাজপুত্র, তোমায় আর কি বলব; যেমনি রূপ তেমনি গুণ!

ধর্ম্মদাস গম্ভীর ভাবে, একটু উচ্চস্বরে, সকলকে শুনাইয়া বলিলেন:—ও সব ঢের বুঝি দিদি! তোমরা শুধু বাইরেটা দেখ বই ত নয়? বুঝতে পারছ না—"উপরেতে চাকন চিকন ভিতরেতে খড়ের বুনন!"

বসন্তসেন, কুমারসেন ও যুবরাজ একবার পরস্পরের প্রতি চাহিলেন। রত্নমঞ্জরী মনে করিলেন কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার ভাই, বসন্তসেনের সহিত ভানুমতির বিবাহ দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন—সে অনুরোধ উপেক্ষিত হওয়ায় তাঁহার রাগ হইয়াছে, আর সেই জন্যই তিনি এরূপ ভাবে যুবরাজকে অপমান করিতেছেন। রত্নমঞ্জরী রাগ করিয়া বলিলেন:—ধর্ম্মদাস, তুমি এত বড় কথা কও! আমি দেখছি তোমায় নিয়ে একসঙ্গে বাস করা কঠিন হয়ে উঠল!

ধর্ম্মদাস। তার আর কি করব বল, তবে একটা কথা বলে রাখি—গরীবের কথা বাসী হলেই মিষ্ট লাগবে!

সকলে চুপ করিয়া রহিল। যুবরাজ রত্নমঞ্জরীকে কথার ছলে জিজ্ঞাসা করিল:—এ রমণীয় উদ্যানটী কে রচনা করেছে মা?

রত্নমঞ্জরী। নারায়ণ নামে একটা বুড়ো লোক—সে আমাদের জাত হলেও মালির কাজ বেশ জানত; তারই যত্নে বাগানটীর এমন শ্রী হয়েছে। আহা, বেচারা বড় ভাল লোক ছিল!

যুবরাজ। তার কি ছেলেপিলে কেউ নাই? আমার বাগানের জন্য একটা ভাল মালি চাই।

রত্নমঞ্জরী। দুঃখের কথা বলব কি বাবা, তার সনাতন নামে একটা অপগণ্ড আছে—সেটা আস্ত বাঁদর; তার দ্বারা কোন কাজ হবে না।

হতভাগার এতদূর স্পর্দ্ধা যে সে আমার ভানুমতিকে বিবাহ করবে বলে একখানা চিঠি পাঠিয়েছিল! তার নাম শুনলে রাগে আমরা জ্বলে মরি।

ভানুমতি। যুবরাজ, আপনি পণ্ডিত—কবি—সুরসিক; বলুন দেখি এই হাসির কথা শুনলে সনাতনকে কি বলে মনে হয়?

যুবরাজ। সে নরপশুকে চন্দ্রাভিলাষী বামন ছাড়া আর কি বলি বল; আচ্ছা, সে কি খুব সুশ্রী?

রত্নমঞ্জরী। নাম কোরো না, বাবা, নাম কোরো না—এমন কুৎসিৎ দুনিয়ায় কেউ দেখে নি!

ধর্ম্মদাস। বটে! কিন্তু কে যেন বলছিল—তোমাদের যুবরাজের চেহারাটা কতকটা তারই মত!

রত্নমঞ্জরী। কি—একটা মালির সঙ্গে তুমি যুবরাজের তুলনা কর! আমি আর তোমার মুখ দেখব না। তুমি আমার ভাই নও—আমার শত্রু; যদি ভাল চাও—এ বাটী ত্যাগ কর!

ধর্ম্মদাস এ অপমান আর সহ্য করিতে পারিলেন না; কোন কথার উত্তর না দিয়া সদাগরের গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। যুবরাজ এই ব্যাপার দেখিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল:—হারে দুনিয়া, এখানে দেখছি চাঁদীই সারবস্তু! সুন্দর বল—কুৎসিৎ বল—সব ঐ চাঁদীর গুণে; নইলে জলজ্যান্ত সনাতন আজ সৌন্দর্য্যের অবতার হ'ল কেমন করে!'

অধিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকাটা যুবরাজ যুক্তিযুক্ত বিবেচনা না করিয়া রত্নঞ্জমরীকে বলিল:—মা, আপনি রাগ করলেন কেন? মামা একটু রহস্য কল্লেন বৈত নয়?

রত্নমঞ্জরী। আহা কি ক্ষমাশীল আমাদের যুবরাজ—উচ্চ বংশের লক্ষণই এই।

যুবরাজ তখন হীরকখচিত নস্যদানি খুলিয়া নস্য গ্রহণ করিতেছিল। রত্নমঞ্জরী সেই মূল্যবান্ দ্রব্যটীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন:—বাঃ—কি সুন্দর নস্যদানি! এটীর কত দাম হবে যুবরাজ?

যুবরাজ। বড় বেশী নয়, লক্ষ মুদ্রা হতে পারে।

রত্নমঞ্জরী শিহরিয়া উঠিলেন। ভানুমতি রত্নমঞ্জরীকে বলিল:—দেখ মা, কুমারের আংটিটী কি সুন্দর! কুমার, ওটীর মূল্য কত?

যুবরাজ। দেড়লক্ষ টাকার বেশী নয়; ভাল আংটি সর্ব্বদা ব্যবহার করি না; যাহোক মা, তোমার ঐ নস্যাধারটী পছন্দ হয়েছে—আমার প্রতি অনুগ্রহ করে যদি তুমি এটী গ্রহণ কর, তবে আমি বড় সুখী হই।

রত্নমঞ্জরী হাসিতে হাসিতে দ্রব্যটী গ্রহণ করিলেন। বসন্তসেন যুবরাজকে টিপিয়া তাহার কাণে কাণে বলিলেন:—"ওকি—ওকি!" যুবরাজ বসন্তের কথায় কর্ণপাত না করিয়া অঙ্গুরীয়কটী ভানুমতির অঙ্গুলীতে পরাইয়া দিলেন।

কুমারসেন বসন্তসেনকে আস্তে আস্তে বলিলেন:—কি সর্ব্বনাশ! বেটা দুহাতে করে বিলাতে আরম্ভ করলে যে! এখন উপায়?

এদিকে মা ও মেয়ে উপহার পাইয়া মনের আনন্দে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। কুমারসেন সরোষে যুবরাজকে বলিলেন:—কি করছ, ফিরিয়ে নাও! আমার জিনিশ আমায় ফেরৎ না দিলে তোমায় কারাগারে দেব!

যুবরাজ—যাও—রাজার ছেলে দিলদরিয়া না হলে হয় না—বলিয়া

অন্দরে প্রবেশ করিল। বসন্তসেন ও কুমারসেনও তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। অল্পক্ষণ পরে ভানুমতির সহিত কথোপকথন করিতে করিতে যুবরাজ পুনরায় তথায় আগমন করিল।

যুবরাজ। ভানুমতি, মা বল্লেন—"যোগ্য পাত্রে কন্যাদান ;" যোগ্য কাকে বল সুন্দরি? যার রূপ আছে—গুণ আছে—কিন্তু অর্থ নাই—সে কি যোগ্য নয়?

ভানুমতি। না—না, তা কেন—তা কেন; তবে কি না—ঐশ্বর্য্যের মর্য্যাদা স্বতন্ত্ররূপ।

যুবরাজ। তবে কি তুমি ঐশ্বর্য্যেরই উপাসক? আচ্ছা ভানুমতি, ঠিক করে বল দেখি, তুমি কি আমায় যথার্থ ভালবাস?

ভানুমতি। কেন এমন নিষ্ঠুর কথা কইছ কুমার? তোমায় আমি এত ভালবাসি যে যদি তুমি আমায় পায়ে ঠেল, তবে নিশ্চয় জেনো এজন্মে আর কখন কাকেও ভালবাসতে পারব না।

যুবরাজ। কিন্তু যদি শোন আমি ক্ষুদ্র পর্ণকুটীরবাসী এক দরিদ্র ভিক্ষুক মাত্র!

ভানুমতি। ব্যঙ্গ কোরো না কুমার—তা কি কখন হতে পারে?

যুবরাজ। যদি হয়?

ভানুমতি। তবে আমি ভিক্ষুকের পত্নী ভিখারিণী! কুমার, জান না কি, প্রেম একটা মহাশ্মশান; সেখানে ধনী দরিদ্র, ছোট বড়, প্রাসাদ কুটীর—সব সমান!

যুবরাজ। ভানুমতি, আমার প্রিয়তমে, কবে আমি তোমায় নিয়ে প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র সেই নির্জ্জন শৈলবাসে গমন করব। কবিতায়

কোলে কবির মত সে রমণীয় গিরি-নিকেতন সুনীল মেঘোৎসঙ্গে সদাই চিত্র-লিখিতের ন্যায় ভাসমান! শুভ্র স্ফটিকমাল্যের ন্যায় পার্ব্বত্য নদী সেই হিমশীতল গিরিবরকে বেষ্টন কোরে আছে—চৌদিকে অসংখ্য নির্ঝরিণী অবিশ্রান্ত কলনাদে অহোরাত্র বিশ্বনাথের পূজায় নিরত! আর সেই বীচি-বিক্ষেপশূন্য চন্দ্রকরোজ্জ্বল হেমকান্তি হ্রদের তীরবর্ত্তী অনিন্দ্যসুন্দর কুসুমিত উদ্যানের নৈশশোভা—কি সুন্দর—কি মনোরম! আশৈশবের স্মৃতিবিজড়িত, পিতৃপিতামহের কীর্ত্তিবিমণ্ডিত, দিব্যপুষ্পমাল্যাভরণভূষিত সে পবিত্র শৈলাশ্রম ছেড়ে কোথাও অবস্থান করা আমার পক্ষে অসম্ভব!

ভানুমতি। যুবরাজ, তোমার সুন্দর বর্ণনা শুনলে ইচ্ছা করে এখনই আমি তোমার সঙ্গে সেইখানে চলে যাই।

যুবরাজ। চল—চল সুন্দরি, আমার শৈলবাসের সৌন্দর্য্য ষোলকলায় পূর্ণ করবে চল; বড় সাধ ঝিল্লীমুখরিত যামিনীযোগে রজতবিনিন্দিত জ্যোৎস্নালোকে তোমার হাত ধরে সেই সুন্দর শৈলসুতার সৈকতভূমে পদচারণ করে জীবন সার্থক করি; ফুল ফুটবে—পাখী ডাকবে—বিভোর হয়ে তার সৌন্দর্য্যসুধা পান কর্‌ব; তোমার গায়ের উপর দিয়ে জ্যোৎস্না গড়িয়ে এসে আমার গায়ে পড়বে! ধন-দৌলত কিছুই চাই না; প্রকৃতির এই অফুরন্ত ঐশ্বর্য্যের কাছে সোণারূপা অতি তুচ্ছ— অতি নগণ্য! ভানুমতি, তুমি পার্থিব-ঐশ্বর্য্যাভিমানিনী, তোমার কি সে স্থান ভাল লাগবে? মনে কর আমার কিছুই নাই!

ভানুমতি। নাথ, আমি কিছুরই প্রত্যাশী নই; চাই শুধু তোমাকে; কুমার, আমার প্রতি কঠিন হ'য়ো না

যুবরাজ। ভাব দেখি সুন্দরি, আমার অবস্থা—আর সেই দুরাকাঙ্ক্ষ দুঃস্থ মালাকার, উন্মাদের বশে যে তোমার পাণিপ্রার্থী হয়েছিল—তার অবস্থায় কোন প্রভেদ নাই ; তা হলে তুমি কি কর ?

ভানুমতি। তা হলে বুঝবে আমি তোমায় কত ভালবাসি ; যুবরাজ ! বহ্নিমুখ-বিবিক্ষু পতঙ্গ আমি—অনলে যখন ঝাঁপ দিইছি, তখন আমি আত্ম-কর্ত্তৃত্বহীনা—আত্মহারা ! তোমায় ভালবাসি—আর আমি কিছুই জানি না !

যুবরাজ আর কোন কথা বলিল না ; কিন্তু তাহার প্রাণে বড় আঘাত লাগিল। মনে মনে বলিল :—কেন এই সরলা বালিকার আমি সর্ব্বনাশ করতে যাচ্ছি ! না—না, এ প্রতিমা ভিক্ষুকের ঘরে শোভা পায় না ! কিন্তু এখন উপায় কি—অনেক এগিয়ে এসেছি !

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বপরিচ্ছেদবর্ণিত ব্যাপার যে দিন সঙ্ঘটিত হয়, তৎপর দিন প্রাতঃকালে উদ্যানমধ্যে যুবরাজ বসন্তসেনকে ডাকিয়া কহিল :—না, আমার দ্বারা এ কাজ হ'ল না ; আমি বিবাহ করব না।

বসন্তসেন। সেকি ! কি হল ?

যুবরাজ। কিছু না—আমার ইচ্ছা।

বসন্তসেন। তবে আমার কাছে শপথ করেছিলে কেন ?

যুবরাজ। না বুঝে ; ক্রোধের বশবর্ত্তী হয়ে ! এখন বুঝছি, ভুল করেছি ; যাকে ভালবাসি তার সঙ্গে এমন বিশ্বাসঘাতকতা করতে নাই। সসম্মানে আমার দারিদ্র্যটুকু মাথায় করে নিয়ে আজই আমি এ স্থান পরিত্যাগ করব !

বসন্তসেন। না, তা হতে পারে না ; বিবাহ তোমায় করতেই হবে ; নতুবা আমরাই তোমায় জালিয়াৎ বলে ধরিয়ে দেব।

যুবরাজ। বর্ব্বর !

বসন্তসেন। যাই বল না কেন—ভানুমতির দুর্দ্দশা আমায় দেখতেই হবে। তুমি যদি পালাও—নিশ্চয় জেনো—অন্য উপায়ে শ্রেষ্ঠি-কন্যাকে চুরী কোরে নিয়ে গিয়ে শেষে তাকে আমারই অর্দ্ধাঙ্গিনী করব।

যুবরাজ। না—না, তা হবে না ; তুমি আমার চেয়েও নির্দ্দয় ; আমার চেয়েও বিশ্বাসঘাতক। ভানুমতিকে তোমার হাতে দিতে পারবো না। আমি বিবাহ করতে প্রস্তুত—আজই তুমি তৎপর হও !

বসন্তসেন। বেশ কথা—তাই হবে ; আমি সেই উদ্দেশ্যেই চল্লুম।

বসন্তসেন দ্রুত প্রস্থান করিলেন। সেই মুহূর্ত্তেই কুমারসেন আসিয়া যুবরাজকে ধরিলেন। কুমারসেন আরক্তনেত্রে কহিলেন :—তুমি কি রকম বেল্লিক হে ?

যুবরাজ। তোমরা যে রকম করেছ।

কুমারসেন। আমি কি তোমায় আংটীটা দিতে বলেছিলুম ?

যুবরাজ। নাই বা বল্লে—তা কি হয়েছে ?

কুমারসেন। তবে তুমি দিলে কেন ?

যুবরাজ। ও অবস্থায় পড়লে তুমিও দিতে।

কুমারসেন। কখনও না।

যুবরাজ। নিশ্চয়।

কুমারসেন। এ ত জুয়াচোরের কথা।

যুবরাজ। জুয়াচোর করলে কে ?

কুমারসেন। ও সব কথা শুনতে চাই না ; তুমি দেবে কিনা বল ?

যুবরাজ। হাতে থাকলে দিতুম।

কুমারসেন। এখন আদায়ের উপায় কি ?

যুবরাজ। কিছু নাই।

কুমারসেন। আমি কিন্তু সহজে ছাড়ছি না !

যুবরাজ। তা ত দেখছি ; উভয় ভ্রাতা অনুগ্রহ করে ডেয়ো পিঁপড়ের মত আমায় কামড়ে ধরে না থাকলে এতক্ষণ ঘরের ছেলে ঘরে গিয়ে বাঁচতুম !

কুমারসেন। এ ত ভয়ানক কথা কইছ ?

যুবরাজ। কি করব—নাচার!

কুমারসেন। আমি কিন্তু দেখে নেব—দেখে নেব!

যুবরাজ। যখন নেবে তখন নিও—এখন দয়া করে একটু চুপ কর। ঐ দেখ, তোমার প্রাণের ভাই ভানুমতির মার সঙ্গে আসছেন।”

রত্নমঞ্জরীকে দেখিয়া কুমারসেন স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন। রত্ন-মঞ্জরী তথায় আসিয়াই যুবরাজের দুই হাত ধরিয়া সজল-নেত্রে তাহাকে বলিলেন:—এ কি শুনছি বাবা, কালই তুমি আমাদের ছেড়ে চলে যাবে?

যুবরাজ। কি করি মা!

পাছে যুবরাজ কোন অসংলগ্ন কথা বলিয়া ফেলে—এই জন্য বসন্ত-সেন তাহাকে বাধা দিয়া আপনিই বলিতে আরম্ভ করিলেন:—কি বলব মা, কুমার আমায় বলছিলেন যে স্বয়ং রাজার আদেশ লঙ্ঘন করিবার সাধ্য তাঁহার নাই। বিশেষতঃ যখন রত্নরাজ লিখিয়াছেন যে, কন্যার গৃহে এতদিন অবস্থান করা রাজপুত্রের উপযোগী কাজ নহে; এতে বিবাহ না হয় সেও ভাল। কুমারের আরো বিশ্বাস, হয় ত মলয়পুরের রাজা তাঁহার কন্যার সহিত যুবরাজের বিবাহের জন্য তাঁর পিতাকে গিয়া ধরিয়া থাকিবেন।

রত্নমঞ্জরী। তবে এখন উপায় কি? রাজাবাহাদুর ত কিছু মন্দ কথা লেখেন নি?

বসন্তসেন। তা বৈকি মা! রত্নগড়ের রাজা হলেন একটা ইন্দ্র চন্দ্রের তুল্য; তিনি কেন রাজকুমারকে কন্যার গৃহে অবস্থান করতে দিবেন। কত লোকে তাঁর পুত্রের জন্য লালায়িত; আমার বিশ্বাস যে যুবরাজ

যদি বিবাহ না ক'রে ফিরে যান, তবে বোধ হয় আর এ শুভ কার্য্যটী ঘটবে না। রাজার কত পারিষদ আছে—তারাই গিয়ে রাজার কাণ ভারি করে দেবে ; বলবে—এতে তাঁর অপমান করা হয়েছে !

রত্নমঞ্জরী। তাইত বাবা—এখন উপায় কি ?

বসন্তসেন। শুধু একটী মাত্র উপায় আছে। মা, যদি আজই ভানুমতির সঙ্গে কুমারের বিবাহ দিতে পারেন তবেই আপনার আশাপূর্ণ হয়, নতুবা কি হবে বলতে পারি না !

রত্নমঞ্জরী। তবে তাই হোক !

যুবরাজ আজ বড় অন্যমনস্ক ; এক দিন ভানুমতিকে পাইবে না বলিয়া তাহার যেরূপ মর্ম্মস্থান ছিঁড়িয়া গিয়াছিল—আজ সেই ভানুমতিকে পাইয়াও তাহার অবস্থা ততোধিক শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। সে ভাবনায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে। রত্নমঞ্জরীর সহিত বসন্তসেনের কথোপকথন কতক তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল—কতক সে আদৌ শুনিল না ; সে হতাশ ভাবে একস্থানে বসিয়া রহিল। রত্নমঞ্জরী কুমারের প্রতি চাহিয়া দেখিলেন। বসন্তসেন তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন—ভানুমতিকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে বলিয়া যুবরাজের এইরূপ ভাবান্তর হইয়াছে !

সহসা ভানুমতি আসিয়া যুবরাজের সম্মুখে দাঁড়াইল। যুবরাজ দেখিল—বালিকার দুই চক্ষে জলধারা। তাহার কান্না আসিল। অনেকক্ষণ পরে ভানুমতির হাত ধরিয়া বলিল :—"তুমি কাতর হইও না ; আমি এখন যাই ; ঈশ্বর যদি দিন দেন—পরে দেখা হবে !"

ভানুমতি সে কথা শুনিল না—কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল :—কোথায় যাবে ? যেথানেই যাও—আমায় সঙ্গে নিয়ে চল !

কুমার একটু হাসিল ; সে হাসি বড় করুণ—বড় মর্ম্মস্পর্শী। ভানুমতি তাহার মর্ম্ম বুঝিল। রত্নমঞ্জরী কন্যার আগ্রহ দেখিয়া পুনরায় বলিলেন :—আজই তবে শুভ কার্য্য সম্পন্ন হউক ?

যুবরাজ ধীরে ধীরে বলিল :—এত তাড়াতাড়ি কেন মা ?

ঠিক এই সময় ধনপতি তথায় আগমন করিলেন। শ্রেষ্ঠী বড় বেশী কথা কন না ; তাহাতে আবার সম্মুখে সহধর্ম্মিনী ! ভয়ে ভয়ে, নিতান্ত কাঙ্গালীটির মত একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া আস্তে আস্তে বলিলেন :—“না হয় দিনকতক পরেই বিবাহটা হত ?”

রত্নমঞ্জরী ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন :—কেন গা !

ধনপতি মিহিস্থর আরো নামাইয়া বলিলেন :—না :—তাই বলছি !

রত্নমঞ্জরী। না—আর বলতে হবে না ; শুভকার্য্য আজই হবে।

ধনপতি। তা—তা—যুবরাজ কিরূপ যৌতুক দেবেন সেটা—সেটা সম্বন্ধে একটা লেখা পড়া—

রত্নমঞ্জরী। আবার—এথনও বণিকবৃত্তি !

ধনপতি। না :—তাই বলছি ; তোমরা যা হয় কর।

এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। সেই দিনই বিবাহ স্থির হইল। সদাগরগৃহে উৎসবের রোল উঠিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

সনৎকুমারের সহিত ভানুমতির বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বসন্তসেন ও কুমারসেনের মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হইয়াছে। সদাগরের গৃহে উপস্থিত আর তাঁহাদের কোন প্রয়োজন নাই। বিশেষতঃ রহস্য প্রকাশ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাদের সে স্থান ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। বিবাহান্তে একবার উভয়ে তাঁহাদের দত্ত পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদি লইয়া যুবরাজের সহিত অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা করিলেন। কিন্তু যখন সে সকল দ্রব্য পাইবার সুবিধা হইল না, তখন বসন্তসেন ভ্রূকুটীপূর্ব্বক রাজপুত্রকে বলিয়া গেলেন :—"দেখা যাবে সুদ শুদ্ধ আদায় হয় কি না ?" অতঃপর দুই বন্ধুতে নিঃশব্দে পলায়ন করিলেন। এমন কি, ধনপতি রত্নমঞ্জরী প্রভৃতি সকলেই তাঁহাদের এই আকস্মিক তিরোধানে কিছু বিস্মিত হইলেন। কিন্তু বিস্ময় প্রকাশের কাহারও অবসর ছিল না। উৎসবের রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গেই কন্যার গৃহে একটা বিষাদের ছায়া আসিয়া পড়ে। সদাগরগৃহের সকলেরই মুখ আজ বিষাদ-কালিমা-মণ্ডিত। নহবতের বাদ্যধ্বনিতে একটা বিষাদের সুর উঠিতেছে। আকাশখানাও যেন সজলনেত্রে উজ্জয়িনীর পানে চাহিয়া আছে।

ক্রমে বিদায়ের কাল উপস্থিত হইল। ভানুমতির চক্ষে জলধারা—সদাগরও বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিতেছেন—উত্তুঙ্গ শৈলশৃঙ্গের ন্যায় বিশাল-কায়া গর্ব্বস্ফুরিতাধরা রত্নমঞ্জরীও মাটিতে পড়িয়া পাঁচ বৎসরের শিশুর ন্যায় কাঁদিতেছেন। ভানুমতির সখীরা তাহাকে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা

করিতেছে। বিবাহের পর মুহূর্ত্ত হইতে যুবরাজের আর সে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তি নাই। তাহার সুন্দর মুখে কে যেন কালি ঢালিয়া দিয়াছে। ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে দেখা যায়—যুবকের চোখের কোণে শুক্নো জলের দাগ! রত্নমঞ্জরী ভাবিলেন—সোনার চাঁদ জামাই ভানুমতির চক্ষের জল দেখিয়া বুঝি এত কাতর হইয়া পড়িয়াছে। তিনি সকলকে সেই কথা বলিলেন। সকলেই মুক্তকণ্ঠে যুবরাজের প্রশংসা করিতে লাগিল! কিন্তু কুমারের এ ভাবান্তরের প্রকৃত কারণ কেহ বুঝিল না। কুমার এখন অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছে। ভানুমতির নেশা তাহারা কাটে নাই; বরং সে নেশা আরো প্রবল হইয়াছে। কিন্তু ভালবাসার সামগ্রীর সহিত সে যে প্রতারণা করিয়াছে তজ্জন্য তাহার মর্ম্মস্থল ক্ষতবিক্ষত হইয়া যাইতেছে। সে এখন কি করিবে তাহা জানে না!

সন্ধ্যাকালে কাঁদিতে কাঁদিতে রত্নমঞ্জরী ও ধনপতি কন্যা ও জামাতাকে বিদায় দিলেন। জগন্নাথ কুমারের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। তার প্রাণে আজ বড়ই আনন্দ—নির্ম্মলা ভানুমতির সঙ্গে চলিয়াছে!

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

সনাতনের যুবরাজ-অভিনয় প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে; পুনরায় সে তাহার পূর্ব্ব নাম ফিরিয়া পাইয়াছে। কিন্তু হতভাগ্যের হৃদয়ে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সে এখন বুঝিতে পারিয়াছে যে, তাহার নিজের চিতা সে স্বহস্তে রচনা করিয়াছে। সে বুঝিয়াছে, অনুতাপের তীব্র অনলে তাহাকে নিজের প্রাণ আহুতি দিতে হইবে। আরো বুঝিয়াছে, সে শুধু নিজের সর্ব্বনাশ করে নাই—সে সরলা বণিক-বালার সুখময় জীবন অঙ্কুরে বিনষ্ট করিয়াছে! মানুষকে তাহার আর মুখ দেখাইবার উপায় নাই। সে নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর, মমতাহীন দস্যু; জানিয়া শুনিয়া সে নরহত্যা করিয়াছে; এ মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত কোথায়?

সনাতন ভানুমতিকে লইয়া আপন ক্ষুদ্র কুটীরাভিমুখে যাইতেছে। সঙ্গে জগন্নাথ ও নির্ম্মলা। পথের ধারে আবার সেই পান্থশালা—আবার সেই ভৈরবীচক্র! শিবরাম সনাতনের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। শকটধ্বনি শুনিয়াই সে ছুটিয়া আসিল; আশা—কিঞ্চিৎ প্রণামী! শিবরাম সনাতনকে যুবরাজ সম্বোধনপূর্ব্বক সরাইয়ে একটু বিশ্রাম করিয়া যাইতে অনুরোধ করিল এবং ভানুমতির প্রতিও প্রচুর সম্মান প্রদর্শন করিতে ত্রুটী করিল না। সনাতন ব্রাহ্মণের অনুরোধ রক্ষা করিল। এবার আর সদানন্দ নাই। যে দিন শিবরাম তাহাকে প্রহার করিয়া তাহার নিকট হইতে রত্নমঞ্জরী-দত্ত অর্থ কাড়িয়া লয়, সেই দিনই সে পলাইয়া গিয়াছে। সদানন্দ এখন শিবরামের পরম শত্রু!

কিছুক্ষণ পান্থশালায় থাকিয়া ভানুমতির মনে একটা সন্দেহ উপস্থিত হইল। সম্প্রতি সে শিবরামকে মহাকালের মন্দিরের নিকট সাধু জ্যোতিষী ভাবে দেখিয়াছে। ওরূপ ব্যক্তি আবার সরাই-রক্ষক হয় কেমন করিয়া? তা ছাড়া সনাতন শিবরামের সহিত বেশ পরিচিতের ন্যায় কথাবার্ত্তা কহিতেছে। কুমারের এ কি আচরণ? আর রত্নগড়ের রাজপুত্রের এইরূপ পর্ণকুটীরে আসিয়া বসিতে একটু লজ্জা বোধ হইল না? ভানুমতি মনে মনে বেশ বুঝিতে পারিল ভিতরে কি একটা গভীর রহস্য আছে। সে নির্ম্মলাকে ডাকিয়া তাহার সঙ্গে একটু দূরে গিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। ইত্যবসরে সনাতন শিবরামের সহিত সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সনাতন বলিল :—যতই বুঝাও না কেন, আমি বলছি, ব্যাপার যখন প্রকাশ হবে তখন আমার সঙ্গে তোমায় শুদ্ধ নিয়ে টানাটানি পড়বে।

শিবরাম। মনেও কোরো না ভৈরবীচক্র! তুক—তাক, তাগ—বাগ, মারণ উচাটন—সব—বলব কি ভৈরবীচক্র—এই নখাগ্রে! এক ঔষধে সর্ব্বরোগের শান্তি হয়ে যাবে!

সনাতন। সে কি ঔষধ?

শিবরাম। কুলকুণ্ডলিনীর পদ্ম-হাতের জিনিস বাবা ভৈরবীচক্র, বলব কি—কথা কয়—কথা কয়! আর এতে তোমার আমার দুজনেরই বেশ দুপয়সা প্রাপ্তি আছে, ভৈরবীচক্র! ঔষধটী দিচ্ছি নিয়ে যাও—বণিক-বালাকে সেবন করাও—ভৈরবীচক্র! বলব কি, উঠে আর ধানের পথ্যি করতে হবে না—আর তিন দিনের মধ্যে একেবারে কর্ম্ম ফর্শা! তারপরই বলব কি ভৈরবীচক্র, তার বহুমূল্য অলঙ্কারাদি

তোমায় আমায় বথরা কোরে নিয়ে দেশান্তরে গিয়ে দিব্য থাকা যাবে।

"জয় মা জগদম্বিকে"—বলিয়া শিবরাম হাসিতে হাসিতে উত্তরের প্রতীক্ষায় সনাতনের দিকে চাহিয়া রহিল। ব্রাহ্মণের ভীষণ প্রস্তাব শুনিয়া যুবকের দেহের শোণিত যেন শুষ্ক হইয়া গেল। সে ঘৃণা ও ক্রোধের সহিত কহিল ঃ—কি—কি বল্লে ব্রাহ্মণ! এততেও তোমাদের ক্ষুধা মিটিল না; হত্যা কার্য্যে প্রণোদিত করছ! সোণা-রূপার জন্য হত্যা! জান না, জান না—মূর্খ—অপদার্থ—পরান্নভোজী—চাটুকার, তোমরা সনাতনের কি সর্ব্বনাশ করেছ! তোমাদের উত্তেজনাতেই আজ আমার এই দুর্দ্দশা! নতুবা কখন এ মহাপাতকে লিপ্ত হতে পারতুম না। হয়ত পাগল হয়ে পথে পথে ভানুমতি—ভানুমতি করে বেড়াতুম! সেও ভাল ছিল!

শিবরাম। আরে চট কেন ভৈরবীচক্র! আমি তোমার মঙ্গলের জন্যই মঙ্গলচণ্ডীর কাছে এক স্বস্ত্যয়ন করে সব পাপ নাশ করে দেবো!

সনাতন। থাক—আর অত অনুগ্রহে আবশ্যক নাই! এটা জেনো মৃত্যু এখন আমার মঙ্গলের নিদান। তুমি কাপুরুষ—মরণে তোমার বড় ভয়—তাই তোমায় সাবধান করে দিয়ে গেলুম।

শিবরাম হতাশ হইয়া বসিয়া রহিল। সনাতন কোন কথা না বলিয়া ভানুমতিকে ডাকিল। ভানুমতি এতক্ষণ নির্ম্মলার সহিত কথা কহিয়া যাহা বুঝিয়াছে তাহাতে তাহার মনের সন্দেহ আরো প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। সনাতন বলিল ঃ—বণিক-বালা, চল যাই!

ভানুমতি উত্তর করিল ঃ—কুমার, তুমি এমন বিবর্ণ হয়ে গেলে কেন?

তোমার সে হাসি আর নাই—তুমি আকাশ পানে চেয়ে থাক—আপনার সঙ্গে আপনি কথা কও—আমায় আর আদর কর না! কেন কুমার?

সনাতন বলিল :—না ভানুমতি, তুমি কিছু মনে কোরো না; আমার শরীর ভাল নেই; এখন যাই চল।

সনাতন ভানুমতিকে লইয়া সরাই ত্যাগ করিয়া আপনার সেই ক্ষুদ্র কুটীর অভিমুখে চলিল। পথে আর ভানুমতির সহিত তাহার কোন কথা হইল না।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সনাতন নগরপ্রান্তে আসিয়া পড়িয়াছে। অদূরে তাহার জীর্ণ কুটীর। ভানুমতি নির্ম্মলার কাছে অনেক কথা শুনিয়াছে। কুমারের হাবভাব দেখিয়াও সে ব্যাপার অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছে; কিন্তু তাহার বাক্যস্ফুরণ হইতেছে না; বিস্ময়ে সে একরূপ বিহ্বল হইয়া গিয়াছে।

একটী বেদনাব্যঞ্জক দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া সনাতন ডাকিল—'ভানুমতি!' বক্তার স্বর বড় করুণ,—বড় হৃদয়স্পর্শী! ভানুমতি স্বর শুনিয়া চমকিয়া উঠিল; বলিল:—কেন কুমার?

সনাতন নিরুত্তর। ভানুমতি পুনরায় বলিল:—কুমার,আমায় ডাকছো?

যুবক একবার কি বলিবার চেষ্টা করিল—পারিল না; পরক্ষণেই একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিল:—বণিক-বালা, যদি আমি তোমার কাছে কোন অপরাধ করিয়া থাকি?

ভানুমতি ব্যাকুল ভাবে উত্তর করিল:—তুমি আমার স্বামী—আমার সর্ব্বস্ব—আমার ইহকাল—পরকাল; তোমার আবার অপ-রাধ কি?

ভানুমতির কথায় সনাতন যেন একটু সাহস পাইয়া বলিল:—যদি আমি তোমার স্বামী হবার অযোগ্য হই—তবে কি তুমি আমায় আর ভালবাসিবে?

ভানুমতি উথলা হইয়া উঠিল। ভাবিল—'যা ভাবিয়াছি তাই কি সত্য!' সে বলিল:—কেন—কেন এমন কথা বলছ?

সনাতন স্থিরভাবে উত্তর করিল :—চল—এই কুটীরে গিয়ে সব বলব!

তাহারা কুটীরদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। সোনার মা দাওয়ার উপর বসিয়া পুত্রের জন্য কাঁদিতেছিল। বৃদ্ধা তাহাদের আগমন জানিতে পারে নাই! ছেলের জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার দৃষ্টি-শক্তি প্রায় লোপ পাইয়াছিল।

সনাতন ডাকিল :—মা!

স্বর শুনিয়া বৃদ্ধা বুঝিল তাহার হারানিধি ফিরিয়া আসিয়াছে। ছুটিয়া আসিয়া সে পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল :—বাবা—বাবা—আমায় ফেলে এতদিন কোথায় ছিলি?

সনাতন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল :—মা. আমি বামন হইয়া চাঁদ ধ'রতে গেছ্লুম। যে সুখস্বপ্নে আমি সারাজীবনটা কাটালুম—আজ আমার সে স্বপ্ন সত্য হয়েছে। এই দেখ মা. সওদাগর-কন্যা ভানুমতি তোমার পুত্রবধূ! কিন্তু, মা, তোমার কথাই ঠিক; কাঙ্গালের ভাগ্যে এ রত্ন সইবে না!

সোনার মা পুত্রের কথা শুনিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল; তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল; মনে হইল পৃথিবীটা বুঝি তার পদতল হইতে কতদূরে সরিয়া গিয়াছে! বৃদ্ধা মাথায় হাত দিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িল।

ভানুমতি কাষ্ঠপুত্তলিকাপ্রায় স্থির ও অবিচলিত ভাবে দণ্ডায়মানা। তাহার চক্ষু পলকশূন্য—সোণার বর্ণ কালিমাময়! কতক্ষণ পরে সনাতনের দিকে চাহিয়া বালিকা বলিল :—এই কি রত্নগড়ের রাজপ্রাসাদ! কুমার, তুমি আমায় প্রতারণা করলে?

সনাতনের চক্ষুর্দ্বয় এখন রক্তবর্ণ—মস্তিষ্ক উত্তপ্ত। সে আবেগের

সহিত উত্তর করিল :—না বণিকবালা, আমি তোমায় প্রতারণা করি নাই —আমি তোমায় হত্যা করেছি! আমি মার্জ্জনার অযোগ্য! আত্মকৃত অপরাধের দণ্ড আমি নিজেই গ্রহণ করব। চল্লুম! ভানুমতি, তুমি সুখী হও; এখনই তুমি তোমার পিতৃগৃহে গমন কর।

সনাতন ঊর্দ্ধশ্বাসে তথা হইতে চলিয়া গেল; তাহার মস্তিষ্ক এখন মহাপ্রলয়গ্রস্ত!

ভানুমতি কথা কহিতে পারিল না—তাহার দুই চক্ষু দিয়া তপ্ত অশ্রু বহিতে লাগিল। এমন সময় সহসা সেইখানে বসন্তসেন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দস্যু যেমন গুপ্তস্থান হইতে সুযোগ বুঝিয়া বহির্গত হয়—ব্যাঘ্র যেরূপ অজ্ঞাতে শিকারের প্রতি ধাবিত হইয়া থাকে—তেমনই করিয়া বসন্তসেন বণিকবালার সম্মুখে আসিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া তাহাকে বলিলেন :—কাঁদ অভাগিনী নারী, তোমার চক্ষের জলে আমার প্রতিহিংসাগ্নি নির্ব্বাপিত হবে! বণিকবালা, তুমি কি অন্যায় কাজ করেছ জান কি? সর্পের মস্তকে তুমি পদাঘাত করেছ—এখন তার ফলভোগ কর। নিশ্চয় জেনো, আমার কর্ম্মকাণ্ডের একটা অধ্যায় শেষ হয়েছে—এইবার দ্বিতীয় অধ্যায়ের আরম্ভ!

তীরবেগে বসন্তসেন প্রস্থান করিলেন। ভানুমতি ছিন্নলতিকার ন্যায় মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূপতিতা হইল। কাঁদিতে কাঁদিতে সোনার মা সেই স্বর্ণ-প্রতিমা কোলে করিয়া বসিয়া রহিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

জগন্নাথ নির্ম্মলাকে লাভ করিয়া আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়াছিল। তাহার আর কোন দিকে দৃষ্টি ছিল না। সে শুধু নির্ম্মলার আঁচল ধরিয়া বেড়াইতেছিল। নির্ম্মলা কিন্তু জগন্নাথের কাণ্ড দেখিয়া মনে মনে হাসিত। চাঁদীর লোভে এতদিন সে এই গলিত-অঙ্গ পলিত-মুণ্ড বৃদ্ধকে ছলনা করিতেছিল। যখন সে বুঝিল শূন্যভাণ্ডে হাত পড়িয়াছে, তখন তাহার ভুল ভাঙ্গিয়া গেল। জগন্নাথকে দেখিলে এখন সে জ্বলিয়া যায়। তবু জগন্নাথ তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে!

ভানুমতি মূর্চ্ছিতা হইবার পর নির্ম্মলা সদাগর-গৃহে খবর দিতে যাইবে বলিয়া প্রস্তুত হইল। যাইবার সময় জগন্নাথ তাহাকে বলিল :— নির্ম্মলে, তুমি চল্লে! আমায় কার কাছে রেখে যাচ্ছ?

নির্ম্মলা বিরক্তির সহিত বলিল :—তুমি চুলোয় যাও; তোমার খবরে আমার দরকার কি?

জগন্নাথ দুই চক্ষু মুছিয়া বলিল :—সাধ্বে, আমায় অনাথ করে যেও না—তোমার দুটী পায়ে পড়ি!

জগন্নাথ নির্ম্মলার স্থূল চরণদুটী যষ্টিবৎ দীর্ঘকর সংযোগে ধারণ করিল। নির্ম্মলা তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। জগন্নাথ কাতরভাবে—"হা অদৃষ্ট, শেষটা নারীর পদাঘাত"—এই বলিয়া ছুটিয়া গিয়া নির্ম্মলাকে আবার বলিল :—"নির্ম্মলে! আবার এসো।"

নির্ম্মলা সে কথায় ভ্রূক্ষেপও করিল না।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

সদানন্দ শিবরামের সঙ্গ ছাড়িয়া কিসে তাহাকে অপদস্থ করিবে—তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল। অচিরে উপায়ও স্থির হইল। সে জানিত শিবরামই সনাতনকে রাজপুত্র সাজাইয়া ভানুমতির সর্ব্বনাশ করিয়াছে। বণিকগৃহে এই সংবাদ বিক্রয় করিলে তাহার অর্থলাভ ও উদ্দেশ্যসিদ্ধি উভয়ই হইবে—এই বিবেচনায় সে ধনপতির গৃহে গমন করিল। তখন বর-কন্যা চলিয়া গিয়াছে। বহির্ব্বাটীতে ধনপতি বসিয়াছিলেন। সদানন্দ গিয়া তাঁহার নিকট সকল কথা বলিল। ধনপতি প্রমাদ গণিলেন।

তখনই নগররক্ষককে ডাকিয়া ব্যাপারটী জানান হইল। শান্তি-রক্ষকগণ শিবরামকে ধরিয়া আনিল। ব্রাহ্মণ নবমীর পাঁটার ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে সদাগরের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। সদানন্দকে সেখানে দেখিয়া ব্যাপার কি বুঝিতে তাহার আর বিলম্ব হইল না। শিবরাম জোড়হাত করিয়া ধনপতিকে বলিল:—দোহাই বাবা, ভৈরবী-চক্র, আমি কিছু জানি না; নীরিহ ব্রাহ্মণ—অহোরাত্র তপ-জপ পূজার্চ্চনা—এই সব নিয়েই থাকি ভৈরবী-চক্র! আমায় কি অপরাধে এখানে আনা হল বাবা ভৈরবী-চক্র!

সওদাগর সদানন্দকে দেখাইয়া শিবরামকে জিজ্ঞাসা করিল:—কি ঠাকুর, একে চিন্তে পার?

শিবরাম। পারি বাবা, ভৈরবী-চক্র, ও দিন কতক আমার কাছে

চাকরী করেছিল; এখন কিন্তু আমার অনিষ্ট করে বেড়াচ্ছে বাবা ভৈরবী-চক্র! কারণ আমি ওকে তাড়িয়ে দিয়েছি!

ধনপতি। তাড়ালে কেন?

শিবরাম। ও চোর!

সদানন্দ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল:—ভোর কোথায় ঠাকুর—এখন যে সন্ধ্যা হয় হয়! সদার শ্রবণশক্তির প্রশংসা ইতিপূর্ব্বেই প্রচারিত হইয়াছিল।

ঠিক এই সময় বসন্তসেন আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং আত্ম-রক্ষার্থ শিবরামের স্কন্ধেই সকল দোষ চাপাইলেন। তিনি সকলকে বুঝাইয়া দিলেন, সনাতনকে যুবরাজ বলিয়া শিবরামই তাঁহার সহিত পরিচয় করাইয়া দেয়। ব্রাহ্মণের কোন যুক্তিই সেখানে টিকিল না।

স্বামীজির 'ভৈরবী-চক্র' তখন ভাসিয়া গেল। সহর কোতোয়ালের আজ্ঞায় রক্ষিবর্গ তাহাকে বাঁধিয়া লইয়া প্রস্থান করিল। শিবরামের কর্ম্ম-জীবনের যবনিকা এইখানেই পড়িয়া গেল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

উলুখড়ে আগুন লাগিলে দেখিতে দেখিতে যেমন তাহা চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, তেমনই এই কুসংবাদ সমগ্র নগরী মধ্যে প্রচারিত হইল। রত্নমঞ্জরী এই সকল কথা শুনিবামাত্র কিছুক্ষণ ধরিয়া চীৎকারে অট্টালিকা কাঁপাইয়া তুলিলেন—পরে একে একে পুরবাসীদিগের প্রতি অজস্র গালি বর্ষণ করিলেন। তাহাতেও শ্রেষ্ঠিপত্নীর তৃপ্তি হইল না। তখন তিনি দিব্য সরঞ্জাম করিয়া বেচারা সদাগরের উপর গিয়া পড়িলেন। রত্নমঞ্জরী স্বামীর সহিত পরামর্শ করিয়া কখন কোন কাজ করেন না। বিশেষতঃ এই বিবাহ ব্যাপারে ধনপতির কিরূপ হাত ছিল পাঠকবর্গ তাহা সম্যক্ বিদিত আছেন! কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে? ধনপতিকে ধরিয়া অনেকটা ছেঁড়াছিঁড়ি না করিলে কিছুতেই রত্নমঞ্জরীর ক্রোধ বা চিত্তচাঞ্চল্য দূর হইত না। সুতরাং শ্রেষ্ঠিপত্নী সদাগরকে নানারূপে পীড়ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্থূল অঙ্গুলীর দ্বারা স্বামীর শীর্ণ অঙ্গে দুই একটী টিপ্‌নী দিতেও ছাড়িলেন না। ধনপতি আঘাত পাইলেও নীরবে সব সহ্য করিলেন। শেষে রত্নমঞ্জরী বলিলেন:—এতদিন কি নাকে সরিষার তৈল দিয়ে ঘুমাচ্ছিলে!

ধনপতি ধীরে কহিলেন:—নাঃ।

রত্নমঞ্জরী। না ত এমন সর্ব্বনাশ হল কেন?

ধনপতি। তা—আমার পরামর্শ ত আর শুনলে না!

রত্নমঞ্জরী। মরণ আর কি! পরামর্শ করবার মত মানুষ কি না! যা জিজ্ঞাসা কর খালি না—না—না—না!

ধনপতি। নাঃ—

রত্নমঞ্জরী। আবার! চুপ করে থাক; নইলে মুখ সেলাই করে দেব। তা এখন চল, মেয়েটাকে গিয়ে নিয়ে আসি; নির্ম্মলার কাছে যা শুনলুম তাতে গিয়ে যে আর বাছাকে দেখতে পাব বলে ত বোধ হয় না! চল—শীঘ্র যাই!

ঘাড় নাড়িয়া ধনপতি পত্নীর প্রস্তাবে সম্মতি জানাইলেন। অনতি-বিলম্বেই তাঁহারা যাত্রা করিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ

সেইরাত্রে রাজ-পরিচ্ছদে ভূষিত সনাতন একটী পর্ণকুটীর হইতে বহির্গত হইয়া গ্রাম্যপথ অতিক্রমপূর্ব্বক নদীতীর ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। বিস্তীর্ণ নদীসৈকত চন্দ্রালোকে হাসিতেছে—নদীর প্রতি জল-তরঙ্গে চন্দ্রালোক প্রতিবিম্বিত হইতেছে—দূরে তরণী হইতে সঙ্গীত-স্বর-তরঙ্গ উন্মুক্ত আকাশ কম্পিত করিয়া ভাসিয়া যাইতেছে—অদূরস্থ রজত-ধবল জ্যোৎস্নাধৌত বনভূমি পাপিয়া কলকণ্ঠে মুখরিত করিতেছে—শীতল-শীকরবাহী মারুতপ্রবাহে তীরস্থ তরুবাজি মর্ম্মরিত হইতেছে। এ সকল কিছুই আজ সনাতনের ইন্দ্রিয়গোচর হইল না। কেবল এক একবার মাত্র নদীতরঙ্গ যেন তাহাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য আহ্বান করিল; যেন সেই কুলু কুলু শব্দ তাহাকে ডাকিয়া বলিল—এস, আমার কোলে এস; আমি এই শীতল বারি দিয়া তোমার সমস্ত জ্বালা নিবারণ করিয়া দিব। তার পর—তলায় কোমলশয্যা পাতা আছে—সেইখানে গিয়া শান্তিতে বিশ্রাম করিও!

সনাতন ধীরে ধীরে নদীর জলে স্পর্শ করিল; সহসা তাহার সেই স্নেহময়ী দুঃখিনী মায়ের মলিন মুখখানি মনে পড়িল। আর তাহার মড়া হইল না। হৃদয়ের জ্বালা হৃদয় দগ্ধ করিতে লাগিল—শীতল সমীরণ তাহার কোন প্রতীকার করিতে পারিল না। যে চন্দ্র কিছুদিন পূর্ব্বে তাহার নয়নাভিরাম ছিল—সেই চাঁদ আজ একবারও তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল না। সনাতন ছুটিতে আরম্ভ করিল। এক একবার তাহার মনে হইল:—কি ছিলাম, কি হইয়াছি! কেন এমন কাজ করিলাম—এ মোহ

কেন আসিল ? এ চৈতন্য পূর্ব্বে ত একবারও উদয় হয় নাই ! সে অনু-তাপশূন্য, নির্ম্মল, প্রশান্ত হৃদয় কি আর ফিরিয়া পাইব না ? অনশনে দিন কাটাইয়াছি---অর্থাভাবে বিবস্ত্র হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে হিমবর্ষী আকাশতলে পড়িয়া কত রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছি ! কই—সে দুঃখ—সে দারিদ্র্য কখন ত হৃদয়কে ইহার শতাংশেও পীড়িত করিতে পারে নাই। তবে কেন এমন করিলাম ! একদিনের একটী ভ্রম—একবারের বুদ্ধিভ্রংশ—জন্মের মত জীবনের সকল সুখ—সকল আশা ভরসা বিলুপ্ত করিল ! এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত নাই ?

সনাতনের অঙ্গে যেন বৃশ্চিক দংশন করিতে লাগিল। সে নদীতীর ত্যাগ করিয়া প্রান্তরপথে চলিল। শুভ্রজ্যোৎস্নালোকে বিশাল প্রান্তর হাসিতেছে—সে দিকে তাহার দৃষ্টি নাই ; দূরে কাননমধ্যে নিশাচর শ্বাপদের ভীষণ রব—সে দিকে কর্ণ নাই। জীবনে যে আস্থাশূন্য তাহার আবার আশঙ্কা কিসের ? সমস্ত রাত্রি পথ ভ্রমণ করিয়া প্রত্যূষে সনাতন নর্ম্মদা তীরস্থ রায়গড় দুর্গ সন্নিধানে আসিয়া একবৃক্ষতলে আশ্রায় গ্রহণ করিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

অনেক ক্ষণ পরে ভানুমতি চক্ষু চাহিয়া কহিল :—আমি কোথায়? সোনার মা ভয়ে ভয়ে লজ্জায় জড়সড় হইয়া বালিকার মস্তকটী বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল :—এই যে মা, তুমি আমার কোলে রয়েছ! বড় কষ্ট হচ্চে কি মা?"

বড় মিষ্ট স্বর—বড় স্নেহমাখা কথা—বড় আদরের স্পর্শ—ভানুমতির প্রাণ গলিয়া গেল। সে সস্নেহে উত্তর করিল :—না মা—আর কোন কষ্ট নাই; তুমি কে মা?

বৃদ্ধা কাঁদিয়া ফেলিল; তাহার তপ্ত অশ্রু বিন্দু বিন্দু করিয়া ভানুমতির ললাটে পতিত হইল। বালিকা বলিল :—কাঁদছ কেন মা?

বৃদ্ধা অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া কহিল :—তোমার জন্যই কাঁদছি মা! এমন সোনার চাঁদ কি আমার এই কুড়েতে শোভা পায়? আহা, আমার পাগল ছেলে কি সর্ব্বনাশ করলে! উঃ—এখনও আমার মরণ হচ্ছে না কেন?

ভনুমতি। কেন মা, আমি ত বেশ আছি!

সোনার মা। আহা, ঈশ্বর করুন তুমি ভালই থাক। কখনও নাইতে খেতে তোমার মাথার কেশটীও না খসে! কিন্তু মা, আমি বেশ থাকব কেমন করে? আমার সনাতন নিজের দোষ বুঝতে পেরে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল! আর কি মা তাকে দেখতে পাব? যদিই বা সে আসে—তোমার মা বাপ কি তাকে ছাড়বে মা?

ভানুমতি। কেন মা, তিনি আমার স্বামী—তিনি ত কোন দোষ

করেন নি; আমার অদৃষ্ট! তাঁর প্রতি অত্যাচার করে কার সাধ্য; সে জন্য ভেবো না মা।

বৃদ্ধার সহিত ভানুমতির অনেক কথাবার্ত্তা হইল। সোনার মা বুঝিল বালিকার মন বড় উচ্চ—বড় পবিত্র; যথার্থই সে সনাতনকে ভাল বাসিয়াছে।

অধিক রাত্রে নৈশ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বহু লোকজন সহ রত্নমঞ্জরী ও ধনপতি বৃদ্ধার কুটীরে আগমন করিলেন। ভানুমতি তাঁহাদের দেখিয়া উঠিয়া বসিল—সোনার মা ঘরের কোণটীতে গিয়া নিজের শতছিন্ন বস্ত্র-খানি দ্বারা ক্ষীণ দেহটুকু আচ্ছাদিত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রত্নমঞ্জরী চীৎকারধ্বনিরূপ ঢক্কা-নিনাদে সুপ্ত গ্রামখানি জাগাইয়া তুলিলেন—হুঙ্কারে শিবাকুলকেও পরাস্ত করিলেন এবং বৃদ্ধা ও তাহার পুত্রের প্রতি অজস্র গালিবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ভানুমতি বহু কষ্টে মাতাকে একটু চুপ করাইল।

সে স্থানে বৃথা সময়ক্ষেপ নিষ্প্রয়োজন বোধে ধনপতি কন্যাকে লইয়া যাইবার জন্য ডাকিলেন। ভানুমতি অতি সঙ্কোচের সহিত তাহার পিতাকে বলিল ঃ—বাবা, পিতৃগৃহে এখন আর আমার অধিকার কি? এখন যেখানে আমার স্বামী—সেইখানেই আমার ঘর; স্বামী দরিদ্র—পর্ণকুটীরবাসী; কি করিব—আমার বিধিলিপি যেমন ছিল তেমনই হইয়াছে! এখন এই পর্ণকুটীরই আমার প্রাসাদ—এই কঙ্করাসনই আমার মর্ম্মরাসন—এই দৈন্যই আমার ঐশ্বর্য্য—এই বৃদ্ধাই আমার জননী—আর সেই ভিক্ষুকই আমার স্বামী! আপনারা গৃহে প্রত্যাগমন করুন—আমার জন্য ভাবিবেন না!

রত্নমঞ্জরী কন্যার মুখে এই সব কথা শুনিয়া একেবারে সপ্তমে চড়িয়া উঠিয়া বলিলেন :—ঐ গো—ঐ—নিশ্চয় বুড়ীটা ডাইনী—আমার মেয়েকে গুণ করেছে! নিশ্চয় গুণ করেছে—কি সর্ব্বনাশ!

ভানুমতি অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া মাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল কিন্তু তাহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। শেষে ভানুমতি দেখিল যদি সে উপস্থিতক্ষেত্রে পিতৃগৃহে না যায় তবে বোধ হয় তাহার স্বামী ও এই বৃদ্ধার অধিকতর বিপদের সম্ভাবনা। সুতরাং সে যাইতে সম্মত হইল। যাইবার সময় বালিকা বৃদ্ধার পদধূলি লইয়া তাহাকে বলিল :—মা, আশীর্ব্বাদ কর শীঘ্রই যেন আমি আবার তোমার কাছে আসিতে পারি।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

স্বচ্ছসলিলা নর্ম্মদার তীরে বনাচ্ছন্ন শৈলশিখরমালা বালসূর্য্যের হেম-কান্তি-কিরণচ্ছটায় উদ্ভাসিত হইয়াছে। শৈলস্থিত রায়গড় দুর্গের নানা রাগরঞ্জিত গবাক্ষরাজি আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে—পাদদেশে বিশাল পরিখার চঞ্চল বারিরাশিতে উন্নত লতামণ্ডিত প্রাচীরের প্রতিবিম্ব পতিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা প্রকটিত করিতেছে।

সনাতন এখনও স্থিরভাবে সেই বৃক্ষতলে বসিয়া আছে। সম্মুখস্থ নর্ম্মদার তরঙ্গের ন্যায় চিন্তাস্রোত তাহার সম্মুখ দিয়া ভাসিয়া যাইতেছে। সহসা সে দেখিতে পাইল—গিরি, বন, আকাশ, প্রান্তর প্রতিধ্বনিত করিয়া অসংখ্য পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈনিক তাহারই দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। সকলেই মালবরাজের সৈন্য। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কাহারও পরিচ্ছদ শোণিতাক্ত—কেহ বা নিরস্ত্র—কাহারও হস্তে তীর আছে ধনুক নাই—কাহারও বল্লম ভগ্ন! সনাতন বেশ বুঝিতে পারিল যোদ্ধৃবর্গ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলাইতেছে। গত রাত্রে জননীর জন্য যেমন তাহার মন একবার কাঁদিয়া উঠিয়াছিল, আজ এই পলায়নতৎপর মালব সৈনিকদিগকে সম্মুখে দেখিয়া জন্মভূমির জন্য তাহার মন তেমনি কাঁদিয়া উঠিল। তখনও তাহার কটিদেশে অসি ঝুলিতেছে; সনাতন সেই শাণিত অসি কোষমুক্ত করিয়া বিপুল বাহিনীর পথ অবোরধ করিয়া দাঁড়াইল! অগ্রবর্ত্তী সৈনিক সনাতনকে বলিল:—“কে তুমি?” সনাতন উত্তর করিল:—“আমার পরিচয়ে প্রয়োজন নাই; তোমরা কে? কোথায় বা চলিয়াছ?”

সৈনিক। দেখিতেছ না আমরা মালব সৈনিক; কিন্তু বড় দুর্ভাগ্য—মালব আর রক্ষা হইল না। যোধপুর-রাজ অসংখ্য ভীল সৈন্যসহ দেশ আক্রমণ করেছেন। সাতদিন যুদ্ধের পর আমাদের পরাজয় হয়েছে। এইবার বৃদ্ধরাজারও প্রাণ সংশয়। সম্মুখস্থ ওই রায়গড় দুর্গে কাল তিনি আশ্রয় নিয়েছেন। বিপক্ষদল তা জানতে পেরে দুর্গ অবরোধ করতে আসছে। ওই—ওই—তাহাদের কোলাহল শোনা যাচ্ছে। পথ দাও ভাই, আর আমরা কি করব?

সুপ্তসিংহ যেমন শিকারীর সাড়া পাইয়া জাগিয়া উঠে—হতাশ সৈনিকের ঐ সকল কথায় ও জয়োন্মত্ত শত্রু-সৈন্যের কোলাহলে আজ সনাতনের নৈরাশ্যময় হৃদয়ে একটা দুর্জ্জয় শক্তি জাগিয়া উঠিল। সে জননীর মুখ—ভানুমতির ভালবাসা—নিজের অপরাধ—সব ভুলিয়া গেল। কে যেন সৃষ্টির কোন অজানিত স্থান হইতে আসিয়া তাহার শতধা ভগ্ন বক্ষদেশে লৌহবর্ম্ম পরাইয়া দিল। শত হস্তীর বল পাইয়া সে সৈনিককে জলদ-গম্ভীর স্বরে বলিল:—বা—বাঃ, তোমাদের রাজা বিপন্ন—দেশ যায়—আর তোমরা পালাচ্ছ?

সৈনিক। কি করব—উপায় নাই!

সনাতন। মিথ্যা কথা।

সৈনিক। না—আমাদের পায়ে আর বল নাই!

সনাতন। অসম্ভব; যে পা হটিতে জানে—সে পা অগ্রসরও হইতে পারে! বুকের বল হারিয়েছ, ভাই, তাই তোমাদের এ দুর্দ্দশা। জান না কি মূর্খেরা, তোমাদের ছাতি দুর্ব্বল হলে রাজছত্র খসে যাবে?

সনাতনের আর সে হতশ্রী নাই; তাহার সেই চিন্তাপীড়িত মলিন

মুখমণ্ডল—বিশীর্ণ দেহ—কুঞ্চিত ললাট—জলভারাক্রান্ত নয়নদ্বয়—অন্য ভাব ধারণ করিয়াছে। তাহার শুভ্রললাটে প্রভাতসূর্য্য আশীষ বর্ষণ করিতেছে—শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে অগ্নিস্রোত ছুটিতেছে—প্রদীপ্ত নয়নে দিব্যজ্যোতিঃ বিকশিত—প্রশস্ত বক্ষ স্ফীত—দেহ অসুরবলে বলীয়ান্! সে দিব্য মূর্ত্তি দর্শনে সৈনিকমণ্ডলী বিস্মিত, মুগ্ধ ও স্তম্ভিত; তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিতেছে:—বোধ হয় দেবদূত! একজন বলিল:—দূত নয়—স্বয়ং ভগবান্! এমনই করিয়া একদিন কুরুক্ষেত্রের মহা সমরাঙ্গনে নর রূপে তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন! নতুবা কে এই বিজনে রাজবেশে আসিয়া আমাদের দেখা দেবে।

সৈনিকদিগকে অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ দেখিয়া সনাতন কহিল:—কাপুরুষের দল, এখন কোথায় যাবে?

সৈনিক। ঘরে যাব।

সনাতন। সেখানে গিয়ে যদি দেখ তোমাদের মা মৃত্যুশয্যায় পড়ে ছট্‌ফট্‌ কচ্ছেন—তবে কি মাকে ফেলে অন্য কোথাও চলে যাবে?

সৈনিক। বাপরে, তা কেন—তা কেন; তাতে আর এতে?

সনাতন। নিশ্চয়—বরং তার চেয়েও বেশী। সে মাকে ছেড়ে যেতে পারবে না—আর তোমাদের এই দীনা জননী জন্মভূমি মালব—আজ যিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িতা—সে মাকে পরিত্যাগ করায় কোন দোষ নেই?

সৈনিক। তাইত দেব—ঠিকই ত বল্‌ছ; তাহলে তুমি আমাদের কি করতে বল?

সনাতন। যুদ্ধকর—বজ্র-হাতে অসি ধারণ কোরে মালবের রক্ষায়

প্রবৃত্ত হও; মহাকালের নাম স্মরণ করে আবার শত্রুব্যূহমধ্যে প্রবেশ কর; তা যদি না পার, তবে সকলে এক সঙ্গে নর্ম্মদার জলে ঝাঁপ দাও!

সকলে "মাভৈঃ মাভৈঃ" রবে যুদ্ধের জন্য নাচিয়া উঠিল। সনাতন বলিল:—এসো মালবের বীর-পুত্রগণ, আমি তোমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছি!

"জয় মালব রাজের জয়"—বলিয়া সকলে সনাতনের সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

ভানুমতির সুখের খেলা, আহ্লাদের হাসি, ঐশ্বর্য্যের গর্ব্ব, বেশ-ভূষার পারিপাট্য—সব ফুরাইয়াছে। সে আর কাহারও সহিত বড় একটা কথা কহে না—যে প্রমদোদ্যানখানি তাহার এত প্রিয় ছিল—সে আর সে দিকে ফিরিয়াও দেখে না; তাহার সুন্দর মুখে কে যেন কালি ঢালিয়া দিয়াছে, পৃথিবীর আলো আর তাহার ভাল লাগে না—সে অন্ধকার গৃহে মুখ লুকাইয়া দিবারাত্র পড়িয়া থাকে। রত্নমঞ্জরী কন্যার মন ফিরাইবার অনেক চেষ্টা করিলেন—কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইলেন না।

এইভাবে কিছুদিন কাটিয়া গেল। হঠাৎ একদিন বণিকের গৃহে ক্রন্দনের রোল উঠিল—রত্নমঞ্জরী আছাড় খাইয়া পড়িলেন—পুরবাসিবর্গের মুখ শুকাইয়া গেল। লুব্ধ-বণিকের প্রচণ্ড অর্থলালসাই তাঁহার সর্ব্বনাশ করিল। অধিক লাভের আশা করিতে গিয়া একদিনে ধনপতি সর্ব্বস্বান্ত হইলেন। শুদ্ধ সর্ব্বস্বান্ত নহে—হিসাব করিয়া দেখিলেন তাঁহার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াও তিনি ঋণমুক্ত হইতে পারিবেন না। অধিকন্তু তিন দিনের মধ্যে পাওনাদারদিগকে চুক্তিমত আরো দশ লক্ষ টাকা না দিতে পারিলে তাঁহাকে কারাগারে যাইতে হইবে! এই টাকা কোথা হইতে সংগৃহীত হইবে? ধনপতি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। পাওনাদারদিগের নিকট তিনি করজোড়ে তিন মাস সময় প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু তাহারা বণিকের এ প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হইল না। তাহার একটু বিশিষ্ট কারণ ছিল। এক সময় ধনপতি

সুদের টাকা লইয়া ঐ সকল পাওনাদারদিগের প্রতি অত্যাচার করিয়াছিলেন ; আজ তাহারা সুযোগ পাইয়াছে !

ধনপতির আহার নাই—নিদ্রা নাই—একাকী তিনি কক্ষমধ্যে পদচারণ করিতে করিতে আপনার অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতেছিলেন। এমন সময় বসন্তসেন সেইখানে: আগমন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বণিক কোন কথা কহিলেন না—গৃহের এক কোণে গিয়া বসিয়া রহিলেন। আগন্তুক দেখিলেন, তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির উত্তম সুযোগ উপস্থিত। এ সুযোগ হারাইলে ভানুমতি লাভ তাঁহার পক্ষে দুর্লভ হইবে। তখন তিনি ধনপতিকে কহিলেন :—শ্রেষ্ঠিবর, আমি আপনার বিপদের কথা শুনে আপনাকে উদ্ধার করবার অভিপ্রায়ে এখানে এসেছি !

উদ্ধারের কথা সওদাগরের নিকট স্বপ্নবৎ বোধ হইল। অর্থ ব্যতীত তাঁহার আর উদ্ধারের পথ নাই। আর সামান্য অর্থ নয়—দশ লক্ষ টাকা ! কুবের আজ ভিখারী হইয়াছে ; ভিক্ষুকের আবার মর্য্যাদা কি ? এখন তিনি কাহারো নিকট এক কপর্দ্দকও আশা করিতে পারেন না ! সুতরাং বসন্তসেনের মুখে উদ্ধারের কথা শুনিয়া ধনপতি একটু নৈরাশ্যের হাসি হাসিলেন। বসন্তসেন বলিতে লাগিলেন :—আপনি বিপন্ন ; এ সময়ে অধিক কথা কহিয়া আমি আপনাকে বিরক্ত করিতে ইচ্ছা করি না। আমি জানি, দশ লক্ষ টাকা হইলে আপনার মর্য্যাদা রক্ষা হয় এবং ভবিষ্যতে আবার আপনার উন্নতির আশা থাকে ; এ অর্থ আমি আপনাকে দিতে প্রস্তুত, কিন্তু ইহার বিনিময়ে আমি ভানুমতিকে চাই।

ধনপতি গম্ভীরভাব ধারণপূর্ব্বক বলিলেন :—অসম্ভব কথা—ভানুমতি বিবাহিতা—তার স্বামী আছে !

বসন্তসেন। সে জন্য নিশ্চিন্ত থাকুন ; দণ্ডের ভয়ে সেই বিশ্বাস-ঘাতক আত্মহত্যা করেছে !

ধনপতি। সত্য কি ?

বসন্তসেন। ঈশ্বরের শপথ—চন্দ্র তারা সাক্ষী !

ধনপতি। তাই যদি হয়—শাস্ত্রানুসারে বিধবার বিবাহ নিষিদ্ধ !

বসন্তসেন। আমি যদি তাতে প্রস্তুত থাকি ?

ধনপতি। আমার তবে আপত্তি নাই !

সওদাগর অন্দরে প্রবেশ করিলেন। যথাসময়ে ভানুমতি জানিতে পারিল যে তাহার ভিক্ষুক স্বামী আত্মহত্যা করিয়া স্বীয় উৎকট অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে !

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

নিশীথরাত্রে ধনপতি ভানুমতির গৃহে প্রবেশ করিয়া কন্যাকে ডাকিলেন :—মা !

ভানুমতি নিরুত্তর। সে তখন গভীর চিন্তায় মগ্ন। চিন্তা এতই প্রগাঢ় হইয়া উঠিয়াছে যে ক্ষণে ক্ষণে সে বহির্জগতের সহিত সম্বন্ধশূন্য হইয়া পড়িতেছে। বালিকা অনন্যমনে ভাবিতেছে—আমি কি নিদ্রিত ? তাহা ত বোধ হয় না। এই যে গৃহ—গৃহসজ্জা—দীপালোক—দীপাধার —সবই দেখিতে পাইতেছি ! আচ্ছা স্বপ্নেও ত এসব দেখি ! তবে কি স্বপ্ন ও জাগ্রত দৃশ্যে কোন পার্থক্য নাই ? আঃ—তাই যদি হয়—জাগ্রত অবস্থা যদি স্বপ্নের মত সম্পূর্ণ অলীকই হয়—তবে কি তৃপ্তি—কি আরাম ! এই যে শতবৃশ্চিক-দংশনের জ্বালা অনুভব করিতেছি—ইহা কি কিছুতেই স্বপ্ন হইতে পারে না ?

ধনপতি পুনরায় ডাকিলেন :—মা !

ভানুমতি চমকিত হইয়া মনে মনে বলিল :—না—না, হয় না—হয় না। যতক্ষণ ঘুম না ভাঙ্গে—ততক্ষণ স্বপ্নকে স্বপ্ন বলিয়া বোঝা যায় না—যতক্ষণ এ দেহ থাকে—যতক্ষণ এই দেহে জাগরণ হয়—ততক্ষণ এ জ্বালাকে মিথ্যা বলিয়া মনে করা অসম্ভব ; এখন বুঝিতেছি আমি নিদ্রিতও নই—জাগরিতও নই—আমি জাগিয়া ঘুমাইতেছি !

ধনপতি তৃতীয়বার ডাকিলেন। ভানুমতি শয্যায় উঠিয়া বসিয়া বলিল :—কেন বাবা ?

ধনপতি। তোমার সঙ্গে দু'একটা কথা আছে ! মা, আমার বিপদের কথা শুনেছ ?

ভানুমতি। হাঁ বাবা, শুনেছি!

ধনপতি। আর শুনেছ মা, সেই বিশ্বাসঘাতক—যে তোমার এই দুর্দ্দশা করেছে—সে আত্মহত্যা করে মরেছে!

ভানুমতি একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল :—থাক—সে কথায় প্রয়োজন নাই ; বাবা, আর কি কিছু বলবেন?

ধনপতি। হাঁ মা বলছি ; জান ত মা আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে—পরশ্বদিন আমাকে কারাগারে যেতে হবে ; আমি অর্থ সংগ্রহ করতে পাল্লুম না।

ভানুমতি পিতার দুঃখে দগ্ধ হৃদয়ে আরো ব্যথা পাইল। বলিল :—বাবা, আপনার উদ্ধারের কি আর কোন উপায় নাই?

ধনপতি। একমাত্র উপায় আছে—সে তুমি!

ভানুমতি। আমি! আমি আপনার উদ্ধারের কি করতে পারি?

ধনপতি। তবে শোন মা! বসন্তসেন দশ লক্ষ টাকা দিয়ে আমায় রক্ষা করতে প্রস্তুত—কিন্তু সে তোমার পাণিপ্রার্থী।

ভানুমতি পুনরায় বাহ্যজ্ঞান হারাইল। সে চিত্রাপিতের ন্যায় পিতার দিকে নির্নিমেষ-নয়নে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিতে লাগিল :—আকণ্ঠ জলপান করিয়া নিদ্রিত ব্যক্তি যেমন স্বপ্নে আপনাকে পিপাসার্থ বোধ করে—এও তাই! আমার আবার বিবাহ! এইবার স্বপ্নের জ্বালা—জাগরণের জ্বালা—সকল জ্বালা—জুড়াইব!

পিতা বলিলেন :—কই মা, উত্তর দিলে না?

ভানুমতি। আপনি সব স্থির করুন—আমি প্রস্তুত!

ধনপতি নিশ্চিন্ত হইয়া প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

সনাতনের নেতৃত্বে পরাজিত মালব সৈন্যগণ যোধপুররাজের ভীল সৈন্যদিগকে পুনরাক্রমণপূর্ব্বক পরাস্ত করিয়াছে। বিপক্ষ-সেনার অধ্যক্ষ ভীল সর্দ্দার নিহত। মালববাসিগণের আজ আনন্দের অবধি নাই। রায়গড় দুর্গে মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। সনাতন আজ বীরভূমি মালবের বীরেন্দ্রসমাজের বরণীয়। সদ্‌গুণের সমাদর রক্ষার্থ বৃদ্ধরাজা স্বয়ং সেই অজ্ঞাতকুলশীল নির্ভীক যুবকের গলে বিজয়মাল্য স্থাপন করিয়াছেন। চতুর্দ্দিকে জয়োন্মত্ত সৈনিকের বিজয়গীতি নর্ম্মদার সুরতরঙ্গে মিলিত হইয়া শৈলে শৈলে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। অপরিচিত রাজবেশী যুবকের শৌর্য্য, বীর্য্য ও মহত্বের কথা মলয়হিল্লোলে সমগ্র মালব ভূমে সঞ্চারিত হইয়াছে।

সনাতন আজ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি। রাজা তাহাকে জায়গীর স্বরূপ মুণ্ডা নামক বৃহৎ পরগণা দান করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত অনুমান বিংশতি লক্ষ মুদ্রার উপঢৌকন তাহাকে দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু সনাতনের কিছুতেই শান্তি নাই। আবার সে পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে; আবার সেই অনুশোচনার তীব্র বহ্নি তাহার হৃদয়ে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। যুবক আর সেখানে থাকিতে পারিল না—রাজসমীপে গিয়া বিদায় প্রার্থনা করিল।

রাজা সস্নেহে বলিলেন :—যুবক, যাবে কেন? আমি তোমায় সৈনিক বিভাগে উচ্চ পদ দিব, তুমি আমার কাছে থাক।

সনাতন বিনীতভাবে নিবেদন করিল :—মহারাজ, এ দাসের প্রতি

আপনার যথেষ্ট অনুগ্রহ আছে। কিন্তু উপস্থিত আমার এখানে থাকা হইবে না। ঈশ্বর যদি দিন দেন—আবার আসব, নতুবা এই শেষ।

রাজা বুঝিলেন সনাতনের জীবনে একটা নিরাশার স্রোত বহিতেছে; তাহার মস্তিষ্ক দুশ্চিন্তায় পীড়িত। তিনি কহিলেন:—কৈ যুবক, তোমার পরিচয় দিলে না?

সনাতন। উপস্থিত আমার পরিচয় দিবার মত কিছুই নাই; তবে একটা কথা বলে যাই—আপনার দত্ত উপহারাদি মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছি; কিন্তু পিতা, বিধাতার এখন কি ইচ্ছা তাহা জানি না! যদি জীবনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় তবে জানবেন—এ বিপুল সম্পত্তি আপনার দরিদ্র প্রজাবর্গের সেবায় নিয়োজিত হবে।

সনাতন রাজার পদধূলি গ্রহণ করিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন:—এখন কোথায় যাবে?

"ঠিক নাই"—বলিয়া যুবক বেগে প্রস্থান করিল।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

আগামী কল্য পাওনাদারদিগকে টাকা দেওয়া হইবে। ধনপতি ঋণমুক্ত হইবেন এবং সেই সময়েই ভানুমতিকে বসন্তসেনের হস্তে অর্পণ করা হইবে। ধনপতির আনন্দের সীমা নাই; বসন্তসেন ততোধিক উৎফুল্ল!

আর ভানুমতি! এই যে ভোর হইয়া আসিতেছে—বিস্তীর্ণ কক্ষে পদচারণ করিতে করিতে কি বলিতেছে বণিকবালা? বিষ খাবে—ষোল ঘণ্টা পরে বিয়ের ক্রিয়া পূর্ণ হবে—পিতাকে ঋণমুক্ত করে পরপুরুষ-স্পর্শের পূর্ব্বমুহূর্ত্তে নিজে সর্ব্ববন্ধনমুক্ত হয়ে চলে যাবে—তাই কি এত আনন্দ? তাই কি অমৃতের অধিক আদর করে বিষ পানের জন্য হস্ত উত্তোলন করছ? না না, তা হবে না—ঐ দেখ, কে হাত ধরেছে যে?

ঊষার অস্পষ্ট আলোকে ভানুমতি দেখিল শীর্ণ দেহ, পাণ্ডুবর্ণ সনাতন ছায়ার ন্যায় কর প্রসারণ করিয়া তাহার হস্তধারণ করিয়াছে। ভানুমতি ভীত বা চমকিত হইল না—সে ধীরস্বরে স্থিরভাবে বলিল:—মরলোক ছাড়িয়া যাইতেছি, তাই কি অমরলোক হইতে আসিয়াছ?

সনাতন। এসব কি কথা বলিতেছ ভানুমতি! আমিত এই মরলোকেই আছি?

ভানুমতি বলিল:—তুমি তবে ছায়ালোকের ছায়া নও? তুমি তবে আত্মহত্যা কর নাই?

সনাতন। এ সব কি বিচিত্র কথা?

ভানুমতি। বলিবার কি আর সময় আছে? তোমায় দেখিয়া বাঁচিতে ইচ্ছা হয় কিন্তু আমি নিরুপায়, অনুমতি কর আমি বিষপান করি!

সনাতনের সকাতর অনুরোধে ভানুমতি সংক্ষেপে সকল ঘটনা জানাইল এবং বলিল:—তুমি সুখী হও—অর্থ ব্যতিরেকে পিতার প্রাণ রক্ষা হইবে না। আমার এই তুচ্ছ দেহটা দিলে যদি তিনি বিপদ্ হতে উদ্ধার হন তাতে কি তুমি আমার উপর অসন্তুষ্ট হবে? দেখ, আমরা দরিদ্র; আমাদের দ্বারা তাঁর ঋণশোধ হবার কোন সম্ভাবনা নাই।

সনাতন তখন নিজের ভাগ্যপরিবর্ত্তনের ব্যাপার ভানুমতির নিকট বিবৃত করিল। অচিরে বণিকগৃহে আনন্দের ধ্বনি উঠিল। বসন্তসেন বহির্ব্বাটী হইতে এই সংবাদ শুনিবামাত্র উজ্জয়িনী ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন।

বলা বাহুল্য, সনাতনের অর্থেই ধনপতি ঋণমুক্ত হইলেন। সোনার মা পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া পরম সুখে সুখী হইল।